জলাপাহাড়

হরেন ঘোষ

কথামালা প্রকাশনী
১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক। বীরেশ্বর বসু, কথামালা প্রকাশনী
১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

মুদ্রক। সুরেন্দ্রনাথ পান নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ। সুবোধ দাশগুপ্ত।

দাম : ২'৫০

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রদ্ধাষ্পদেষু

রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টির একটানা শব্দ টিনের ছাদে। অকাল বর্ষা। এসময়ে তেমন বৃষ্টি নামে না। তবু যখন ডাউহিলের কোণে ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ জমে, কালো হয়ে ওঠে, আকাশ আর ভার বইতে পারে না তখনি সুরু হয় রিমঝিম বৃষ্টি। মাত্র কিছুক্ষণ। আবার সব পরিষ্কার। কুয়াশার পুরু চাদরটা সরে যায়। সবুজ পাহাড় সদ্যস্নাতা কিশোরীর মত সুকুমার পবিত্র হয়ে ওঠে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে খেয়ালি হাওয়ার লুকোচুরি চলে।

আজও হঠাৎ বৃষ্টি এলো। মনে হচ্ছিল, হলেও হতে পারে। নাও হতে পারে। এমন তো প্রায়ই কালো মেঘ জমে ডাউহিলের কোণে। আবার বাতাসের এক ঝাপটায় কোথায় হারিয়ে যায়।

শীত বাড়ছে দিনের পর দিন। পাহাড় নেশাখোর বুড়োর মত ঝিমুছে দিনে রাতে। কুয়াশার পুরু চাদর জড়ানো সারাক্ষণ। হাত পা মাথা কান অবশ হয়ে আসে। হাড়কাঁপানি শীত, বাতাস সূঁচ বেঁধায় সর্বাঙ্গে। অন্ততঃ তিন মাস তো চলবে। প্রতি বছরই আসে, আবার চলে যায়। মনে হয়, এবার শীত বেশি অন্যবারের তুলনায়, বোধহয় সহ্য করা যাবে না। কষ্ট হয় খুব, তবু দিন কেটে যায়। বাসন্তী হাওয়া এসে মন ভুলিয়ে দেয়।

গনগন করে জ্বলছে কাঁচাকয়লার আগুন। ওরা গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। লোহার আঙাটিও লাল হয়ে উঠেছে। বাইরে ঘন কুয়াশা। এই বিকেলেই ঘরের ভেতরে অন্ধকার নেমেছে। তবু আলো জ্বালেনি ওরা। আলো জ্বাললেই খরচ বেশি। যতক্ষণ না জ্বেলে পারা যায়।

মজলিশ জমে উঠেছে ওদের। কোন বিশেষ কথা নয়, যার যা খুশি তাই বলে চলেছে। এক সুতোয় গাঁথা মালা নয়,

আলাদা আলাদা ফুল। খেয়াল খুশি মত ছড়ানো। হিস্‌স্‌ শব্দ করে চায়ের গেলাসে চুমুক দিল যশবীর—তাতো! থু থু করে ছড়িয়ে দিল চারিদিকে। এতটা গরম বুঝতে পারেনি। জিভ পুড়ে গেছে। খিলখিল করে হেসে উঠলো শাইলি। যেন কত মজার ব্যাপার ঘটেছে।

- যেমন যখন তখন চা খাওয়া, ঠিক হয়েছে! তখনো হাসি থামেনি তার। বার বার চা তৈরী করতে হয় তাকেই। মাঝে মাঝে ভারি রাগ হয়। চায়ের পাতা তুলে এনে উনুনের পাশে রেখে শুকিয়ে নিজেই হাতমাড়াই চা তৈরী করে। খরচ কমই। চায়ের পাতা গরম জলে ভেজালেই হল। ঘন বাদামি রঙ, না লাগে চিনি, না দুধ। একটু গোলমরিচের গুঁড়ো শুধু। তবু চায়ের পাতা তুলে আনতেও কষ্ট কম নয়। কে কোথায় দেখে ফেলে! তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। সেই চা যদিও বারবার খায়, কদিন চলে!

ওর হাসি দেখে রেগে গেল যশবীর। কোন কথা না বলে ঘাড় গুঁজে চুমুক দিল গেলাসে। এবার তাকালো শাইলির দিকে, চোরাচোখে। কাঁচাকয়লার আগুনের লাল আভা লেগেছে শাইলির ফুলো ফুলো গালে। গায়ের রঙ যেন আরো রঙিন হয়ে উঠেছে। একটা অবাধ্য ইচ্ছে দুর্বার হয়ে উঠলো মনের মধ্যে। শাইলি ধরতে পেরেছে ওর মনের ভাব। দুষ্টু হাসি হেসে চোখ বড় করে তাকালো। যশবীর জানে, শাইলি ভাবছে, আচ্ছা লোক তো, সময় অসময় জ্ঞান নেই। কিন্তু শাইলি ইসারায় দেখালো ঘরের কোণের দিকটা।

চোখ ফিরিয়ে দেখলো যশবীর। তার এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না। শান্তবীর ঘাড় নীচু করে আপন মনে সাদা ভেড়ার লোমের মোজা বুনে চলেছে। নিজেরাই যোগাড় করে আনে ভেড়ার লোম। অল্প দামে কেনে কসাইদের কাছে। দড়ি পাকিয়ে উল তৈরি করে। সোয়েটার, সাফলার, মোজা বোনো। নিজেদের দরকার

যতটা রেখে, বাকিটা বিক্রি করে দেয়। দেখতে সৌখিন না হলেও কাজে দেয়। শীতের যম।

বিরক্তির ভাব ফুটলো চোখেমুখে, দীর্ঘশ্বাস ফেললো যশবীর। ওর চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসলো শাইলি। এবার আরো চটে উঠলো যশবীর। যত নষ্টের গোড়া ঐ ছেলেটি। ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা লাথি বসিয়ে দেয়। তাহলে গড়াতে গড়াতে পড়বে ঐ পাহাড় বেয়ে একেবারে ধোবী ঝোরায়। পাথরে ঘা খেয়ে টুকরো হয়ে যাবে ঐ বড় মাথাটা। তারপর সব শেষ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে। একটা ভারি পাথরের মত সারাক্ষণ চেপে বসে আছে বুকের ওপর।

এবার রাগ হল শাইলির ওপর। যত নষ্টের মূলে ও-ই। আমি তো কতবার তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি, মেরেছি, খেতে দিইনি কত দিন। শাইলিই জোর করে রেখে দিয়েছে। কত দরদ! মায়া-দয়ার আকাশ একটা! অথচ কেউ হয় না ওর। আমারি বা কে হয়? কেউ না। পথের ছেলে। পথে অমন কতই তো পড়ে থাকে। কেন যে মরতে ওকে এনেছিলাম পথ থেকে কুড়িয়ে। সেদিন মদের ঘোরে মনটা বড় নরম হয়ে পড়েছিল হঠাৎ। রাত্তির বেলায় কাঁদছিল রেললাইনে বসে বসে। মা নাকি ফেলে চলে গেছে! পালিয়েছে আর একজনের সঙ্গে। বাবা তাই দূর করে দিয়েছে। অমন তো কতই হয়। পথে পথে ভিক্ষে করছে অমন কত ছেলেমেয়ে। সেই যে এল, একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। যেন এটাই ওর ঘরবাড়ি। একটা অভিশাপের মত ওদের জীবনে এসেছে যেন। প্রায়ই ক্ষেপে যায় যশবীর। রাগ হয় নিজের ওপর, শাইলির ওপর। কখনো মনে হয় হতচ্ছাড়া পাজিটাকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলে।

অথচ শান্তবীরের জন্যে কতই বা খরচ হয় ওর। প্রায়ই ভাবে মনে মনে। এই তো বছর দশ-এগার বয়েস, এরি মধ্যে নিজে রোজগার করে। শরীর যদি ঠিক থাকতো তাহলে আরো বেশি

রোজগার করতো। দুই হাটুতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাটে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ও নাকি জন্ম থেকেই ও রকম। পরে ওর মার খোঁজ পেয়েছে যশবীর। তার চেনা মেয়ে দমিনী। শুনে চোখের জল ফেলেছে কিন্তু ফিরিয়ে নিতে চায় নি শান্তবীরকে। ওর এখনকার কর্তা নাকি খুব বদরাগী। আগের পক্ষের ছেলেকে পেলে হয়ত মেরেই ফেলবে! দমিনী বলেছিল, শান্তবীরের বাবার দোষেই নাকি পায়ের ঐ অবস্থা। কিন্তু যশবীর জানে, দোষ ঐ দমিনীর। আজ এর ঘর, কাল ওর ঘর, কত ঘর যে গড়েছে আর ভাঙছে মেয়েটা! ভেবেছে যশবীর ওসব মেয়ে ঘর গড়তে পারে না, তাই ছুটে ছুটে মরে। ওরা আগুন জ্বালতে পারে। যেখানে যায় আগুন জ্বালে। যদি শাইলিও অমন করে তাকে ছেড়ে চলে যায়? ধক্ করে উঠলো বুকের মধ্যে। যা তা কি সব ভাবছি আমি! আর ভাববো না এসব। যাবে না ও যাবে না। ওকে কত যত্ন করি, আদর করি, কত ভালবাসি। আমাকেও খুব ভালবাসে ও।

আগুনের তেজ কমে এসেছে। বৃষ্টি কমেছে কিছুটা, তবে থামেনি পুরোপুরি। চোখাচোখি হতেই মুখ ভ্যাংচালো শাইলি। যশবীর অসহায় ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে হাতের চেটো আগুনে শেকতে থাকলো। এই বৃষ্টিতে তো বাইরে যেতে বলা যায় না শান্তবীরকে। বৃষ্টি না হলে ও নিজেই চলে যেত এতক্ষণ। বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতো। ট্রাক, ট্যাক্সি যেগুলো এসে থামতো, তাড়াতাড়ি সেগুলোর ধুলো মুছতো, খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্যাসেঞ্জার ডেকে এনে তুলে দিত গাড়িতে। ড্রাইভাররা গাড়ি ছাড়বার আগে যা দুচারপয়সা দিত পকেটে রেখে দিত। আনা দশবারো রোজগার হয়ে যেত ইতিমধ্যে। ঘরে এসে সব পয়সা তুলে দিত শাইলির হাতে। সেদিক থেকে ছেলেটা ভালো।

পকেট থেকে টিনের কৌটো বার করে তিনটে কটুয়া বার

করলো যশবীর। শাইলির হাতে একটা দিয়ে ডাকলো শান্তবীরকে —এতা আইজা।

কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে কটুয়া নিয়ে ঠোঁটে চাপিলো শান্তবীর। মোটা চিমটে দিয়ে একটা জ্বলন্ত কয়লা তুলে নিয়ে প্রথমে শাইলি, তারপর শান্তবীর ও নিজের কটুয়া ধরিয়ে রেখে দিল চিমটেটা। ভুস ভুস করে ধোঁয়া ছাড়লো তিনজন। কটুয়ার উগ্রগন্ধে মুহূর্তে ভরে গেল ছোট্ট ঘরটা। শাইলির দিকে তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে বললো যশবীর—আন্ধারো ভয়ো বাতি বাল।

খকখক করে কেশে উঠে দাঁড়ালো শাইলি। সত্যি বেশ অন্ধকার হয়েছে, এবার ঢিবরি জ্বালতে হবে।

এইবার বৃষ্টি থেমেছে প্রায়। ভাবলো যশবীর, বেরোতে হবে একটু পরই। বেশ শীত! পকেটে আনা চোদ্দ আছে। রাতটা জমবে ভালো।

এখনো জড়তা কাটেনি সবটা। তবু উঠতে হল। শাইলি ডাকছে। খাবার তৈরী হয়ে গেছে। বড় বোতলে চা ভরে রেখেছে। উঠে পড়লো যশবীর। আচ্ছা মেয়ে তো, অত রাত পর্যন্ত জেগেছে তবু সেই ভোবে উঠেছে। পাশে তাকালো। শান্তবীরের বিছানা, মানে দুতিনটে পুরোনো বস্তা জড়ানো রয়েছে। সেও উঠে বেরিয়ে গেছে। আর দেরি করা চলে না। গ্যারেজ থেকে ট্রাক বার করে নিয়ে যেতে হবে ঘুম। সেখান থেকে মালবোঝাই করে শিলিগুড়ি। ফিরতে সেই সন্ধ্যে। সপ্তাহে একটা দিন ছুটি নেয় ও। অন্য বন্ধুরা নেয় না বিশেষ। নেবেই বা কি জন্যে? ঘরের চেয়ে বাইরের ফুর্তি তাদের কম নয়। যশবীরেরও যে সে লোভ নেই তা নয়। তবে শাইলি আসার পর সামলিয়ে নিয়েছে নিজেকে। এসব ব্যাপারে বেশি জানাজানি হলে আবার অশান্তি বাড়বে।

থলির ভেতর চায়ের বোতলটা পুরে এগিয়ে দিল শাইলি।

—মনে করে বাজার করে আনবে। মাছ চাই কিন্তু।

হেসে ঘাড় নেড়ে থলিটা হাতে নিল যশবীর। ঠিকই, মাঝে মাঝে মুখবদল করা দরকার। সেই একঘেয়ে ডাল, ইস্কুশ, শাইশাক, মূলো আর গুনদ্রুক। অরুচি ধরে যায়। মাছটা ভালোই লাগে মাঝে মাঝে। দেখি বাড়তি প্যাসেঞ্জার কেমন জোটে। বরাত ভালো থাকলে নির্ঘাৎ জুটবে। শাইলির গালে একটা টোকা মেরে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল যশবীর।

এবার সারা দিন একা একা। নিজের জন্যে আর রাঁধতে ইচ্ছে করে না। তবু ভাত নামিয়ে একটা ঝোল রেঁধে নিতে হবে। শান্তবীর আসবে বারোটার পর। বড় ফাঁকা লাগে। একঘেয়ে, একা। অথচ এমনতো ছিল না। ঘর বাঁধতে গেলে অনেক কিছু ছাড়তে হয়। ভাবতে ভাবতে ভাতের হাড়িতে জল ঢাললো শাইলি। দরজার কাছে পায়ের শব্দ হল। কে এল আবার! বুকটা কেঁপে উঠলো। সে নয়তো? মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল। খুশি হল শাইলি। একগাল হাসলো—মনে পড়লো বাজে এতদিনে?

হাসিতে দুটি ছোট ছোট চোখ বুজে গেল যন্তরের—তোদের মত তো বসে খাইনা, সময় পাব কখন বল? একবার কেঁপে উঠলো শীতের প্রাবল্যে— সারো জাড়ো। এখনো আঙাটি জ্বালিস নি?

—অত কয়লা কোথায় পাব বাজে। এসো, এই চুলার ধারে এসে বোসো, জাড়ো কম লাগবে। ভাতটা হয়ে গেলে চা খাওয়াব তোমায়। তুমি এলে ভালোই হল। একা একা ভাল লাগে না আমার।

—তা একা থাকিস কেন? মিটমিটিয়ে হাসলো যন্তরে—কোন কাজের নস তুই। এতদিন যশবীরের সঙ্গে ঘর করছিস, এখনো একটা বাচ্চা হল না। কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের ব্যাপার।

তোমার ভারি মুখ খারাপ। যা-তা বলো যখন-তখন। লজ্জায় মুখ লাল হল শাইলির।—এতটা বয়েস হল তাও স্বভাব বদলালো না।

এবার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো যন্তরে—আমারও মাঝে মাঝে ভারি একা একা লাগে। মনে হয় বিয়ে করি ফেলি একটা। কি আর এমন বয়েস হল! এই সবে চার-কুড়ি দুই। তবু দেখতো কেমন তাগড়া শরীর। চোখে দেখ্‌তে পাই এখনো, একটা দাঁত পড়েনি, চুল সব সাদা হয়নি। একটু কুঁজো হয়েছি এই যা। তবু এই বয়েসে দুআড়াই মণ কাঁচা কয়লা বয়ে নিয়ে উঠি ঐ ডাউহিল পাহাড়ে। নিজের পেটের জন্যে রোজগার করতে হবে তো! কেই বা খাওয়াবে বল! মুখের সেই প্রাণখোলা হাসিটা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল শেষের দিকে।

—সে কি কথা! নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারে না শাইলি।—এত বয়েস হয়েছে তোমার? মনেই হয় না তো। অত হয়েছে ভাবিনি আমি। কেন, তোমার তো কত আপনজন রয়েছে তারা খাওয়াতে পারে না? এখন তোমাব বিশ্রাম নেওয়া উচিৎ।

—আপন লোক আছে ঠিকই, তবে কে কাকে দ্যাখে বল। আমরা তো আর লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক নই যে বই পড়ে সব শিখবো। নিজেরা যা ভালো বুঝি তাই করি। এই এখানেই তো আমার কত নাতিনাতিনি রয়েছে, সবকটাকে আমি আবার চিনিও না। তোর তিনটে বোজু মরে গেছে, দুটো পালিয়েছে—আমার এই পাঁচটা বৌয়ের একপাল ছেলেমেয়ে হয়েছে। সব হিসেবও নেই। কেউ দ্যাখে না রে, আমাদের সমাজে কেউ কাউকে দ্যাখে না। যে্‌যার নিজেকে দেখতে হয়। এতক্ষণে ওর কুঞ্চিত গালে চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।—নে চা খাওয়া দেখি। তোর ভাত হয়ে গেছে এতক্ষণে।

দুঃখ হয় বুড়োর জন্যে। এত থেকেও কিছু নেই ওর। একটা কাঁটার খোঁচা খচখচ করে মনে। এই বুড়ো বয়সেও খেটে খেতে হয় যন্তরেকে। পারেও বটে। কেমন উদাস হয়ে পড়ে শাইলি।

—তোর সেই ল্যাংড়াটা কোথায়? চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে জানতে চাইলে যন্তরে।

—ইষ্টিশনে গেছে। ঐ গাড়ি সাফ করে আর প্যাসেঞ্জার যোগাড় করে পয়সা রোজগার করে। একটু বড় হলে তাড়িয়ে দেব। এখন মায়া লাগে।

—কেন ঐ বাজে কাজ করতে দিস? কামানে পাতিটেপার কাজে লাগিয়ে দিলে ন আনা রোজ পাবে। এখানে তো ঠিক নেই কোন দিন কত পাবে। ডাইভারদের দয়া।

—কে জুটিয়ে দেবে ওকে কাজ? আমার চেনাজানা নেই। সেই কবে ছোট বেলায় পাতি টিঁপতাম। তাছাড়া ঐ ল্যাংড়া কি পারবে ঐ কাজ!

—কেন পারবে না? জোর দিয়ে বললো যন্তরে—ও-তো কঠিন কাজ নয় তেমন। দাঁড়া আমি এই হপ্তায় যাব ছোটা শিবরিঙ কামানে। মানবীর সর্দার আমায় খুব মান্যিগণ্যি করে। আমার দুনম্বর বৌয়ের দিকে আত্মীয়। ভায়রা ভাই সম্পর্ক ছিল আর কি। এখনো খাতির করে। ওকে বললেই ঢুকিয়ে দেবে। তবে দুদিনের রোজ ওকে দিতে হবে রকৃশি খেতে।

—তাই দেখো, যদি পার। বসে বসে খাওয়ার চেয়ে কাজকর্ম করা ভালো। ও-কাজ পেলে রোজগারও ঠিক থাকে। এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল শাইলি। একটা তরকারি রাঁধতে হবে। শুধু ভাত তো খাওয়া চলে না।

—শুনেছিস শাইলি, খুব বড় যুদ্ধ বেধেছে। লড়াই! এতক্ষণে যেন আসল খবরটা দিল যন্তরে।

—সে কি? কোথায়? কার সঙ্গে? ধড়াস করে উঠলো ওর

বুকের মধ্যে। মুখচোখ অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তে। গলা বুজে এল প্রায়! বিড় বিড় করে বললো—লড়াই!

—দূর বোকা। ঘর কাঁপিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো যন্তরে। তোর মুখচোখ অন্ধকার হল কেন? অত ভয়ের কিছু নেই। এখানে যুদ্ধ নয়রে। সে অনেক দূরে। আমি তো চারিদিকে ঘুরি, এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাই, তাই শুনি। বাবুরা বলে, সাহেবেরা বুঝিয়ে দেয়। আমি তো আর বুঝি না সব, শুনে যাই। শোন, ঐ আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মন আর অংরেজরা খুব লড়াই করছে।

—তাই বল! এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে শাইলি।—তাহলে আমাদের এখানে নয়?

—নারে না। তবে আমাদেরও লাভ অনেক। আমাদের রাজা তো অংরেজ। তারাও যুদ্ধ করছে, তাই আমাদেরও লড়াইতে যেতে হবে। আর এই গুর্খাদের অংরেজরা খুব ভালোবাসে। এমন পল্টন নাকি হয় না। এত সাহসী, বিশ্বাসী। আমরা পাহাড়ি, মরতে ভয় পাই না কি না! এই যে শতশত ছেলে আমাদের, কত গরীব, খেতে পায় না, কোন কাজকর্ম নেই, না খেয়ে অসুখে ভোগে, চোর ডাকুও হতে পারে না—বাড়ির চাকর হয়, দারোয়ানগিরি করে। গরীব বলে লেখাপড়াও শিখতে পারে না। তাদের একটু সুবিধে হবে। লেবং—জলাপাহাড় থেকে ডাক এসেছে—যত জোয়ান মরদ সবাইকে পল্টনে যেতে হবে। আমি এখন ভাবছি, যদি জোয়ান হতাম, ঠিক চলে যেতাম লড়াইয়ে। এখনো গায়ে যা তাগদ আছে, যেতে পারি, কিন্তু ওরা হাসবে, নেবে না। মনমরা হয়ে যায় যন্তরে। আজ উঠি আমি।

দরজা পর্যন্ত এল শাইলি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো যন্তরে—সে আসে না-তো আর?

মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল শাইলির মুখ। বুঝেও না বোঝার ভান করে অস্পষ্ট স্বরে বললো—কে?

—আরে সেই শয়তান শুকুলাল। খবরদার ঢুকতে দিবি না এখানে। এখন খুব পায়ে ধরে সাধাসাধি করবে। আমাকে খুব খোসামোদ করে। পাত্তা দিস না ওকে। ওর মিষ্টি কথায় ভুলবি না একদম। তখন মনে ছিল না? তোর মত মেয়ের গায়েও হাত দিত। এখন বুঝচে পাজি বেটা। যশবীরের ওপর খুব হিংসে ওর। যশবীর অনেক ভাল। ওরে ছেড়ে যাবি না কিন্তু তুই। ওর কাঁধে আলগোছে হাত রাখলো যন্তরে।—আমি যাই আজ।

—আবার এসো বাজে। ক্ষীণস্বরে বললো শাইলি। মনটা কেমন ভার হয়ে পড়েছে আবার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেতরে এল ও।

প্রায় লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকলো যশবীর। মাছের থলিটা শাইলির হাতে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—ভোক লাগেও, ছিট্টো খান্নু দে।

তৈরী হয়েই ছিল শাইলি। ওর জন্যে মোটা রুটি বানিয়ে রেখেছিল। জানে, এসে এক মিনিট দেরি করতে পারবে না যশবীর। খিদের জ্বালায় হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে।

—খবর শুনেছিস? আনন্দ আর ধরে না যশবীরের।—বহুৎ সারো লড়াই সুরু ভয়ো। যেন যুদ্ধ এসে রাতারাতি ওদের বড়লোক বানিয়ে দেবে।

এত আনন্দ কিসের বুঝে পায় না শাইলি। তার তো ভয়ই করে। কত লোক মরে, অত্যাচার হয়, সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। যুদ্ধ কখনো ভালো হতে পারে! মানুষ, মানুষকে মেরে কি আনন্দ পায়? আর আশ্চর্য! যুদ্ধের খবরে বুড়ো যন্তরে বাজে থেকে এই যুবো যশবীর সবাই খুশিতে ডগমগ। শুধু সেই খুশি হতে পারছে না। সেই তখন থেকে বারবার বুক কেঁপে উঠছে তার। একটা অমঙ্গলের ছায়া রক্তধারায় ছটফট করছে বারবার।

এবার আরো ভয় পেয়ে গেল। যদি যশবীর পল্টনে যেতে চায়? যদি চলে যায় আমায় ফেলে? মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল তার। আমাকে দেখাশুনো করবার কেউ থাকবে না। সেই ফাঁকে সেই পাজি শুকুলালটা ঠিক এসে হাজির হবে। তখন তাকে ঠেকানো যাবে না। সত্যি বলতে তার হক্‌ই তো বেশি। সে তো শুকুলালেরই বিয়ে করা বৌ। একই জাত বর্ণ, দেখেশুনে বিয়ে দেওয়া। যশবীর তো কামী, সমাজে জল চলে না। আর সে হচ্ছে ছেত্রীর মেয়ে। ও-তো সহ্য করতে না পেরে চলে এসেছে যশবীরের সঙ্গে। যশবীরের ভয়েই শুকুলাল চুপচাপ থাকে। জানে ও হচ্ছে ট্রাক-ড্রাইভার। এ অঞ্চলের সবাই ওর পক্ষে। একবার ক্ষেপে গেলে কেটে টুকরো করে ফেলবে। ঐ পাহাড়ের নিচে চিরকালের মত তাকে লুকিয়ে রাখবে। শিয়াল, শকুন, চিতুয়ার খাবার হবে মাত্র। তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে ওর কথা। মন কেমন করে।

—তোর আবার কি হল? ধমক দিয়ে হেসে উঠে যশবীর—আমি তো আর পল্টনে যাচ্ছি না। গেলেই কিন্তু ভাল হত। কত টাকা রোজগার করতাম। তোকে কত টাকা পাঠাতাম। ওদিকে কত নতুন দেশ দেখা হত। তাছাড়া আনন্দ ফুর্তি। মুখ টিপে হাসে যশবীর।

মন হালকা হলেও রেগে যায় শাইলি। মনে মনে বলে, যাও না, মজা বুঝবে গেলে। এসে আর আমাকে পাবে না এখানে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো শান্তবীর। দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে শাইলির কাছে গিয়ে ওর হাতে খুচরো পয়সাগুলো দিল—আজু বারো আনা ভয়ো। এক ঝিলিক হাসি ছড়ালো মুখে চোখে।

—তেরো রোটি উয়াঁ ছ। চিয়া বনাএর খা। কোণের দিকে ওর রুটি ঢাকা দেয়া ছিল, দেখিয়ে দিল শাইলি।

খেতে খেতে ওর দিকে ফিরে তাকালো শান্তবীর—আসা, লড়াই সুরু ভয়ো অরে।

এবার চিৎকার করে উঠলো শাইলি। এর মুখেও যুদ্ধের খবর। সবার মুখেই একই কথা।—লড়াই লাগেও তো হামরো কে ভয়ো ?

ধমক খেয়ে চুপ করে গেল শান্তবীর। সে ভেবে পেল না, কি দোষ করলো সে। আপন মনে ঘাড় নীচু করে রুটি চিবুতে থাকলো ও।

ছুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলো শাইলি, সত্যই চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে। কেমন শান্তশিষ্ট নিশ্চিন্ত জীবন ছিল তাদের, আর তেমন নেই। চারিদিকে একটা ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য জেগেছে। সে জানতো ঘুমপাহাড়ের ওপরে জলাপাহাড় আছে। কিন্তু সে জলাপাহাড় তো ঘুমিয়ে ছিল এতদিন। আজ হঠাৎ এ ভাবে জেগে উঠলো কেন ? জলাপাহাড় যেন রক্তপিপাসার জ্বালায় জ্বলে উঠেছে। এখন সে আর জলাপাহাড় নয়, জ্বলাপাহাড়। সবাই ওখানে গিয়ে পুড়ে মরবে। আগুন দেখে যেমন ঝাপিয়ে পড়ে পোকামাকড়, তেমনি সবাই ছুটে চলেছে ওখানে। যেন কী এক নেশায় পেয়েছে সকলকে। ওর বুক কেঁপে ওঠে। কাউকে বলতে পারে না মনের কথা, বোঝাতে পারে না। বুঝতে চাইবেও না কেউ। সবাই হাসবে। ঠাট্টা করবে। এমন কি যশবীরও হেসে উঠবে তার আশঙ্কার কথা শুনলে। তাই বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকে। মনে মনে গুমরে মরে। একমাত্র তাকে একটু বোঝে যন্তরে বাজে। তা সেই বুড়োও আসে কালেভদ্রে। খেটেখুটে সময়ই পায় না। এতটা বয়েস হল, নিজেই রেঁধে খায়। দেখাশুনো করবারও কেউ নেই। তবু আশ্চর্য ! কত হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ লোক। কোন নালিশ নেই, অভাব অভিযোগও জানায় না। অমন যদি হতে পারতাম ! সবাই যদি অমন হত।

শান্তবীর বলে—তেতি টাড়ো যান্নু শকদি না। খুব্রে ছুখছ। চায়ের পাতা তুলতে অতদূরে যেতে পারবে না সে। পায়ে ব্যথা করবে। সত্যিই তো, ছুহাটুতে ভর দিয়ে হাটে। এই সিঁড়িগুলো

দিয়ে উঠতে-নামতে কত কষ্ট হয়। অতদূরে যাওয়া তার পক্ষে খুবই কষ্টকর। শান্তবীর নিজেই প্রস্তাব করেছে, বাদাম বিক্রি করবে এবার থেকে। চিনে বাদাম। দুচারটে বাদাম দিয়ে ঠোঙা বানালেই হল। এক এক আনা। তাছাড়া চা, সিঙ্গাড়া, বিস্কুট, সুস্তলা এসবও বিক্রি করা চলবে। দোকানদারদের কাছ থেকে নিয়ে বিক্রি করবে। ওরা কমিশন দেবে। শাইলি যদি বাদাম ভেজে দেয় সে ঠোঙায় পুরে নিয়ে বিক্রি করবে। গাড়ির সময় ষ্টেশনে সব বিক্রি হয়ে যাবে। সস্তায় খবরের কাগজ কিনে আনবে, ঠোঙা বানাবে। চিন্তিত হয় শাইলি। প্রস্তাবটা মনে ধরে। রোজগার বাড়বে সংসারের। বেশ হয় তাহলে। কিই-বা কাজ সারাদিন! এখন যশবীর রাজি হলেই হয়।

শুধু পাড়ায় নয়, চারিদিকে, শহরশুদ্ধ সোরগোল পড়ে গিয়েছে। যত জোয়ান ছেলে, যে যার কাজ ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে জলাপাহাড়। স্কুলের উঁচুক্লাসের ছেলেরাও দলে দলে চলে যাচ্ছে ওখানে। বাড়িতে না বলে, পালিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসছে। চা-বাগানে কুলির অভাব। ওখান থেকেও সব রাত্রে পালিয়ে আসছে। ন-আনা রোজ বারো আনা রোজে মন নেই আর। সারা দিন ভরে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তুলে তুলে ঝাঁকা বোঝাই করা আর নয়। তার ওপর বকুনি, গালাগাল, সব জুগিয়ে চলা, রোজগারের ভাগ দেওয়া। তার চেয়ে যুদ্ধ অনেক ভালো। লেফট-রাইট মার্চ করা। কাঁধে বন্দুক, পায়ে বুট, খাকির য়ুনিফর্ম। খেয়ে পরে থাকা যাবে। তাছাড়া মরতে ভয় পায় না পাহাড়িরা। মরতে তো একদিন হবেই। দুঃখ কষ্ট অভাবে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মত মরা ঢের ভালো।

এখন শুধু মেয়েরা, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চা-বাগানে কাজ করে। বাকি সব ছুটছে 'ভর্তিতে' নাম লেখাতে। জলাপাহাড়, জলাপাহাড়—সবার মুখে এক কথা। নেশার টানে ছুটছে সকলে।

এবার যাবার দিন। দলে দলে ষ্টেশনে আসে, মা বোন আত্মীয়-স্বজন। ট্রেন এসে থামে। পরণে খাকির পোষাক, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পায়ে ভারি বুট। গলায় গাঁদাফুলের মালা। কেউ বা খাদা পরিয়ে দেয় গলায়। শাদা কাপড়ের টুকরো। পবিত্র মালার মত। এবার কিছুক্ষণ কথাবার্তা, সান্ত্বনা, কান্নাকাটি। তারপর ট্রেন ছাড়ে। ওরা দরজায় দাঁড়ায়, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়, হাত নাড়ে। রুমাল নাড়ে। মা বোন বৌ ছেলেমেয়ের চোখে জল।

এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে শাইলি। সে বিশেষ কাউকে বিদায় জানাতে আসেনি। এসেছে ওদের সবাইকে দেখতে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে এদের মুখগুলো। ভট্রু শিঙের আড়ালে হারিয়ে যায় ট্রেন। আর দেখা যায় না। পায়ে পায়ে ফিরে আসে নিজের আস্তানায়। ভাবে, মানুষ কী নিষ্ঠুর। কেন যুদ্ধ করে? কী আনন্দ পায়? এই যে এরা সব চলে গেল, কত বাপ-মার একমাত্র ছেলে, কত মেয়ের একমাত্র অবলম্বন, এইসব সুস্থ সবল জোয়ান—এদের কজন আবার ফিরে আসবে? অনেকে হয়ত ফিরবে জীবনের মত পঙ্গু হয়ে। আজ কেমন আনন্দ করে ওরা যাচ্ছে, তেমন আনন্দ করে তো ওরা ফিরবে না। হঠাৎ মনে হল তার, যদি যশবীরও অমনি করে তাকে ফেলে চলে যায়? না, না, ও যাবে কেন? 'ওকে আমি যেতে দেব না। ও গেলে আমি মরে যাব ঠিক। জোর করে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়।

মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে আজ, তবু ঘর চিনতে অসুবিধে হল না যশবীরের। ইদানীং কমিয়েছিল মাত্রা, তাই অবাক হল শাইলি, হঠাৎ আজ এমন হল কেন? ওকে ধরে শুইয়ে দিল বিছানায়। জুতো খুলে রাখলো। একদিক দিয়ে ভালো যশবীর, মাতাল অবস্থায় তার গায়ে হাত তোলে না। শুকুলাল এমনি অবস্থায় তাকে বেদম প্রহার করতো। মনে পড়লে এখনো শিউরে
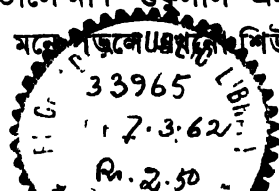
ওঠে শাইলি। সেই শুকুলাল এখন কেঁচোর মত কুপোকাৎ। সাপের ছোবল নেই আর।

—জানিস শাইলি লড়াই সুরু হয়েছে। এবার ধনী হয়ে যাব। তোকে কত কত শাড়ি, চোলি মুজেত্র কিনে দেব। হাতের গয়না, কানের দুল কিনে দেব। জড়িতস্বরে আধবোজা লাল চোখ মেলবার চেষ্টা করে বলে যশবীর।

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে শাইলির, চাই না, চাই না আমার অতশত। ভালো না, যুদ্ধ মোটেই ভাল জিনিষ নয়। ধমকের স্বরে বলে এবার—আজ এত বেশি 'রকসি' খেয়েছ কেন ?

—আনন্দে, ফুর্তিতে। বহুৎ মজা। এবার থেকে তিন ট্রিপ করে মারবো, দেখবি কত পয়সা কামাবো। এখন আর আমি পাবলিক মাল বইব না। একটু দম নেয় যশবীর। চোখ মেলবার চেষ্টা করে। —এখন শুধু শিলিগুড়ি জলাপাহাড়। দিনে তিন ট্রিপ। তাইতো মনে খুব ফুর্তি হল। শুকনায় নেমে টেনে নিলাম দুবোতল। খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে যশবীর। হঠাৎ চিৎকার করে বলে—ছিটো, ছিটো, আমাকে তুলে ধর।

ওর দুই বগলের নিচ দিয়ে হাত দিয়ে তুলবার চেষ্টা করে শাইলি, পেরে ওঠে না। বড় ভার। যা চেহারা একখানা। আর সামলাতে পারে না যশবীর, হড়হড় করে বমি করে দেয় ওর গায়ে, বিছানায়। দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ঠোঁট টিপে ধরে শাইলি। সারা ঘরে দুর্গন্ধ। এখন আবার ধুতে হবে সব। রাগ হয় যশবীরের ওপর। মুখে একটি কথাও বলে না, শুধু দুচোখের কোণে জল এসে পড়ে। মনে মনে বলে, সবার মুখে ঐ এক কথা—জলাপাহাড়, জলাপাহাড়। নেশায় পেয়েছে যেন। কি হবে বেশি টাকা দিয়ে ? বড়লোক হয়ে ? টাকা তো মানুষকে খারাপ করে দ্যায়। এখনি দুচারপয়সা বেশি পেলে পেট পুরে ষাঁড়-রকশি গেলে যশবীর, তখন তো সবসময় চুর হয়ে থাকবে। আর অন্য মেয়ের পেছনে

নষ্ট করবে টাকা। আমাকে আর ভালোবাসবে না। কিছু বলতে গেলে মারধোর করে তাড়িয়ে দেবে। বিয়েকরা বৌকেই যখন তখন তাড়ায় এরা, আর আমি তো ঘরছাড়া বৌ ওর। চাইনা, আঁমাদের আর বেশি টাকা চাইনা। গরীব থাকা ঢের ভালো। ঝরঝর করে অশ্রুধারা বইল ওর ছুগাল বয়ে।

এখন বসন্তকাল। আর সেই হাড়কাঁপানো শীত নেই। ঘোমটা খুলে ভিজে চুল শুকোতে দিয়েছে প্রকৃতিরাণী। ফুরফুরে হাওয়া। ঝাউ-পাতায় মর্মর, অজানা পাখির কলতান। গাছে গাছে কচি সবুজ নতুন পাতার সমারোহ। জরাজীর্ণ পুরোনো সাজ ফেলে পাহাড় এখন নতুন বেশ পরেছে। ঝরণায় ক্ষীণরেখার জলধারা, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নেচে হেসে গড়িয়ে চলেছে। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা বরফে নানারঙের খেলা সকাল-সন্ধ্যায়। তবু প্রকৃতির এই উদার ঐশ্বর্যে হারিয়ে ফেলতে পারেনা শাইলি। কী একটা অজাত ভয়ের পাথর সারাক্ষণ বুকে চেপে আছে।

যশবীরের আনন্দ আর ধরে না। সেই ভোরে বেরিয়ে যায় আর ফেরে সেই রাত.করে। এখন আর অবসর নেই, বিশ্রাম নেই। দিনে তিনটে ট্রিপ। তবুও ক্লান্তি নেই ওর। পাবলিকের মালপত্র নেয় না এখন, শুধু মিলিটারীদের জিনিষপত্র জলাপাহাড়ে পৌঁছে দিয়েই আবার শিলিগুড়ি। তবু কপাল ভালো। খালি ফিরতে হয় না। ছুচারটে প্যাসেঞ্জার জোটেই। যা জোটে তাই লাভ। ওটা বাড়তি রোজগার। শুধু তো টাকাই নয়। একটু হাসি, কটাক্ষ, গায়ে গায়ে বসা, উষ্ণ স্পর্শ, উচ্ছল কলহাসি। মন মাতাল করে দেয়। মুহূর্তের জন্যে ভুলে যায় ঘরের কথা, শাইলির কথা। মনে হয় সে যেন অনন্তকাল ধরে এমনিভাবে চলেছে ষ্টিয়ারিঙে হাত রেখে। আর তার পাশে বসে আছে একটি বছর কুড়ির মেয়ে, অনর্গল কথা বলছে অর্থহীন, হেসে গড়িয়ে পড়ছে ওর গায়ে, পান

চিবুচ্ছে, খোঁপায় গোজা গন্ধরাজের সৌরভের সঙ্গে দেহসৌরভ মিশে রক্তধারা চঞ্চল করছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি হাত ফসকে ষ্টিয়ারিঙ হুইল পথ ভোলে, ঐ অতল গহ্বরে পড়ে যায় এই চক্রযান, তাতেও যেন কোন ক্ষোভ নেই। সে যেন তাই চায়। থাকুক তার ঘরবাড়ি, শাইলি। হঠাৎ স্বপ্নজগৎ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে।

—রোকি দেও, রোকি দেও।

—ইয়ে মো বির্সেও। হাসে যশবীর। সত্যিই তো সে ভুলে গেছে একেবারে। গাড়ি থামায়, ও নেমে যায়।

এবার পাশের আসন ফাঁকা। মনটাও ফাঁকা মনে হয়। সান্ত্বনা দেয় মনকে, আমার তো শাইলিই আছে। কেন তবে মন এত উতলা হয়? শাইলিকে তো আমি ভালোবাসি। এরা তো পথে যেতে আসতে দুদণ্ড কাছে আসে, আবার দূরে সরে যায়। ক্ষণিকের অতিথি। এই-তো এদের নিয়ম। আজ আমার পাশে বসে যেমন হাসলো, গল্প করলো, কাল আবার কালুমান, রণধোজ, কাঁইলার পাশে বসে ঠিক অমনি করবে।

বেশ ভালো রোজগার হচ্ছে এখন। সব টাকা নষ্ট করে লাভ নেই। একটু একটু করে জমাতে হবে। নানা পরিকল্পনা করে আপন মনে। শাইলিকে শাড়ি গয়না দিতে হবে। বেচারীকে কিছুই দিতে পারি না আমি। তবু চায়না মুখ ফুটে। শুধু ওকে খাটিয়ে মারি আমি। তারপর এই কিরাই বাড়ি ছেড়ে দেব, ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরী করবো আমি। শহরে না হোক, বস্তির দিকে, চা বাগানের গা ঘেসে। ছোট হোক, তবু তো নিজের হবে। চারিদিকে কিছুটা জমি থাকবে, সেখানে হবে বাগান। বাড়ির চারপাশে বারি না থাকলে মানায় না। খুব মকাই হবে, নিজেরা খাব সেই মকাই ভেজে, পুড়িয়ে, মকাইয়ের ভাত করে, বাদবাকি বিক্রি করবো বাজারে। আর হবে রাইশাক,

মূলোশাক। খাব, বিক্রি করবো। গুনক্রক তৈরী করবো। সারাবছর খাওয়া চলবে। ইস্কুশ ফলবে বাগানে। কিছু কপি, শালগম, ঘিউশিমি, বীমশিম, বীট, গাজর। এখানে তো এসবের চাষ করতে বেশি খাটনি নেই। আমিই করবো যতক্ষণ থাকি, বাদবাকী সময় শাইলি করবে। বেশ মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান ছেলে হবে একটি। আমাদের দুজনের শরীরই তো ভালো। বেশি চাইনা—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ওরা বড় হবে। শান্তবীর অতদিন থাকবে না। কি হবে পরের বোঝা বয়ে? নিজের থাকতে কেন আর পরের ছেলে মানুষ করবো? পথের ছেলে পথে চলে যাবে। পা দুটো ঠিক হলে ও করে খেতে পারতো। মনে হয় ঠিক হবে। আগের চেয়ে কুঁজোভাব কমেছে অনেকটা। আর একটু বয়েস বাড়লে আরো কিছুটা ভালো হবে মনে হয়। এখনি বেশ মটর সাফসোপ করে, এবার কিছুদিন ক্লিনার থাকবে, তারপর নিজেই চালাতে শিখবে। একটা ট্রাক বা বাস না হয় জুটিয়ে দেব। ওই পা দুটোই যত চিন্তায় ফেলেছে। থাকুক না হয় ততদিন। একটু মায়াও পড়ে গেছে। আগের মত যখন ইচ্ছে বকতে, মারতে ইচ্ছে করেনা। ওকে কাঁদতে দেখলে একটু কষ্টও হয়। কেউ নেই বেচারীর।

যশবীরের চিন্তা যেন থামতে চায়না। আপন মনে ভেবে চলে। একটু টাকা জমলে একটা গাই কিনবো। শান্তবীর দেখা শুনো করবে। এখানে তো ঘাসপাতা অনেক, তাই অসুবিধা হবে না। তারপর—তারপর যদি আরো টাকা জমাতে পারি, নিজেই একটা গাড়ি কিনবো। একটা ফোর্ড না হয় ডজ। পরের গাড়ি চালিয়ে হাতে কড়া পড়ে গেল, আর ভালো লাগে না। মাসের শেষে গোনা মাইনে। মালিককে ভয় করে চলতে হয়। পথের রোজগার পথেই শেষ হয়। ওর থেকে ক টাকাই বা হাতে রাখা যায়? নিজের গাড়ি থাকলে আমার মান বাড়বে

কত। সবাই খাতির, খোসামোদ করবে। আমার ছেলেমেয়েদের অন্যরকম ভাবে মানুষ করবো। ওদের লেখাপড়া শেখাবো। মটর ড্রাইভারি করতে হবে না, চা বাগানে পাত টিপতে হবে না, কুলিগিরি করবে না—পল্টনেও যাবে না। মেয়ে হলে তাকেও লেখাপড়া শেখাবো। ভালো ঘরে ভালো বর দেখে বিয়ে দেব। ভাবনার ভেলায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে যশবীর। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। আশ্চর্য যাদু জানে এই হাত দুটো। এত বাঁকের পর বাঁক, পাহাড়ি পথ, অনায়াসে পেরিয়ে এসেছে। এবার শুকনার শেষ বাঁক পেরিয়ে গেল। এখন সোজা পথ—সমতলভূমি। এ্যাকসিলেটারে জোরে চাপ দিতে হবে। আপন মনে হেসে ওঠে যশবীর। আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ অন্যরাজ্যে চলে গিয়েছিলাম। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলাম। ভাগ্য ভালো কোন এ্যাকসিডেন্ট হয়নি। অথচ হতে পারতো যখন-তখন। সেই তিনধারিয়া ছাড়িয়ে এই শুক্না পর্যন্ত চলে এসেছি, খেয়ালই ছিলনা এতক্ষণ। সোজা ফাঁকা পথ পেয়ে হু হু বেগে গাড়ি ছোটাল যশবীর। তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে জলাপাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে বাড়ি।

বিরাম নেই যেন। পরপর চারপাঁচটা আপট্রেন আসছে প্রতিদিন। একটিও সাধারণ লোক নেই। সব মিলিটারী। সবাই ছুটিতে আসছে, বিশ্রাম নিতে আসছে। পৃথিবীর নানা দেশের লোক। গল্প শোনে শাইলি। খুব ইচ্ছে করে ছুটে যেতে। ওদের দেখতে। তবু জোর করে নিজেকে দমন করে। দমিনি দোলমা, নেপটি, বুধু—ওরা সবাই কত করে বলে, ওকে সাধাসাধি করে যাবার জন্যে। তবু যায় না ও। কানে আসে চিৎকার হৈ হুল্লোড়। অমরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, আফ্রিকান, অংরেজ—আরোও কত নাম করে ওরা। বিশেষ করে নেপটি। ওর দাদা স্কুলে পড়ায়, সেই নাকি বুঝিয়ে দেয় ওকে। আর ও এসে

বিজ্ঞের মত হাত-মুখ নেড়ে ওদের কাছে গল্প করে। কত সতেজ, সবল, হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ এইসব গোরারা। কত দূর দেশ থেকে এসেছে মা, বাবা, বৌ, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে। কখনো আবার দেশে ফিরে যেতে পারবে কিনা তাও জানেনা। কদিনের জন্যে আসে ওরা বিশ্রাম করতে, আনন্দ করতে জলাপাহাড়ে। এখানকার প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ ওদের মন আরো সবুজ, সতেজ করবে। তবু মন ভার হয়ে যায় শাইলিব। কত দূর থেকে ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে আসে এবা।

নেপটি বলে—তোর যত বাড়াবাড়ি, চল না দেখে আসি। বড় ভালো ঐ গোরাবা।

দমিনি চোখ টেপে—তুই একেবাবে বুড়ি হয়ে গেছিস! যশবীর ছাড়া পৃথিবীব আব কিছু চিনিস না তুই।

—যাঃ ধমক দেয় শাইলি,—বড় বাজে বকিস তুই। জুটিয়ে নে না নিজেও একটা। দেখবি কত মজা। কদিন আব এমনি থাকবি ?

দোলমা ফিক কবে হেসে ফেলে—ওকে আর তোর পরামর্শ দিতে হবে না। ও আমাদেব চেয়ে অনেক ওপবে। একজনকে নিয়ে ওর তৃপ্তি হয় না। এর মধ্যেই তিনবাব পেট খসিয়েছে।

—তোকে কিন্তু খুন কবে ফেলবো। রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে দমিনি।

—যা সত্যি তা বলেছি আমি। কে না জানে তোব কথা। ছোটবেলা থেকেই দেখছি তোকে। কত বারণ কবেছি, তবু শুনবিনা। পুরুষগুলোর কথায় নেতিয়ে পড়িস। জানিস না, ওরা এক একটা শয়তান। মজা লুটে সরে পড়ে। ওদের আর কি! ভুগতে হয় আমাদের। দোলমা গম্ভীর হয়।

আমিও কতবার ভাবি শক্ত হব, পারি না রে। মনে মনে ঠিক করি আর ভুল করবো না, আবার কী যে হয়ে যায়

বুঝতে পারিনা। এই ছাখনা কদিন ধরে রতনলাল যাতায়াত করছে।

আথার ডুববি তুই পোড়াকপালি। এত ঠেকেও শিক্ষা হয় না তোর। এবার প্রথমে বিয়ে করতে বলবি তারপর বিছানা। উপদেশ দেয় দোলমা। শাইলি মন্তব্য করে না, শোনে চুপচাপ! সে জানে সব, তবু রাগ হয়না, ঘেন্না হয় না দমিনির ওপর। মায়া হয়, দুঃখ হয় দমিনির জন্যে। ভারি সরল মেয়ে। বোকা। যা অন্যায় করুক না, সব বলে নিজের মুখে। তাছাড়া দুঃখী খুব। নিজের বলতে কেউ নেই। দোলমাদের পাশের ঘরে থাকতে দিয়েছে ওকে। নিজেই রেঁধে বেড়ে খায়। আর দিনের বেলা ষ্টেশনে থাকে, মাল বয়ে বেড়ায়। থাকার মধ্যে ওর শরীরখানা। এত অভাবে অযত্নে চিন্তায়ও শরীরটা ঠিক রেখেছে। আর ওটাই যত নষ্টের গোড়া। সবাই ছুটে আসে। ও-ও পারেনা নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে। কড়া হতে পারে না। পরপর তিনবার, সে কি কাণ্ড ওকে নিয়ে। দোলমা, নেপটিরাই বাঁচিয়েছে। তবে এবার দোলমা বলে দিয়েছে, আবার যদি ফ্যাসাদ বাধে দূর করে দেবে। আর দেখবে না। দমিনিও প্রতিজ্ঞা করেছে, খুবসামলে চলবে, সাবধানে থাকবে, আর কক্ষনো অমন হবেনা।

—কি হল রে তোর আবার? দোলমা চট করে জড়িয়ে ধরলো শাইলিকে।

—নাঃ কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো শরীরটা। নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলো শাইলি।

—ওঃ ফিক করে হাসলো দমিনি—অমন হয়। বাধিয়েছিস বল।

—যাঃ লজ্জায় লাল হল শাইলি,—তুই ভারি ইয়ে। কিছু হয়নি আমার। ওরা তিনজন মুখ টিপে হাসলো এ ওর দিকে চেয়ে।

—খুব চেপে যাচ্ছে। বললো নেপটি।—ঠিক আছে কদিন লুকিয়ে রাখবি!

অবশেষে এলো ওরা চারজন। একটা ট্রেন আগেই এসেছিল, আর তিনটি পার্টি আসছে পেছনে। যেন বাজার বসেছে, হৈ হুল্লোড় চেঁচামেচির অন্ত নেই। ও তাকিয়ে দেখলো। সত্যি, সব যেন বদলিয়ে গিয়েছে রাতারাতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই দৌড়ঝাঁপ করছে, বাদাম, চা বিক্রি করছে, ডবল তিন ডবল দামে। কেউ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলছে, বকশিস সার, বকশিস। মজা দেখবার জন্যে দুচার আনা ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একদল ছেলে। মারামারি কাড়াকাড়ি করে, এ ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে পয়সা নেবার চেষ্টা করছে। একফাঁকে দুতিন জন আবার ছবি তুলে নিচ্ছে। নেপটি ফিসফিস করে বলে—জানিস ওদের দেশে গিয়ে এই ছবি দেখাবে, দাদা বলেছে। আমাদের দেশ নাকি ভিখারির দেশ!

তাই নাকি? চোখ বড় বড় করে তাকায় শাইলি।

দলবেঁধে গোরারা ঢুকছে চায়ের দোকানে। ওদের বয়সী মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। হাসিহাসি মুখ।

আর একটা ট্রেন এসে থামলো। সবাই ছুটে গেল সেখানে। নেপটি দমিনিও ছুটেছে। দোলমা দাঁড়িয়ে রইল ওর সঙ্গে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটলো—বকশিস, বকশিস। হুমড়ি খেয়ে পড়লো পয়সার ওপর। পেছনে মটর প্যাঁক প্যাঁক করছে, খেয়াল নেই। হাসি পেল শাইলির। দুচারটে স্কুলের ছাত্র নিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজনকে। দোলমার দিকে তাকালো শাইলি।

—ওরা সব বিদেশের ডাকটিকিট, পয়সা, কোট জোগাড় করে, জমায়।

—কি হয়! অবাক চোখে জানতে চায় শাইলি।

—এমনি। সখ।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চা বিক্রি করছে—হট টি, হট টি,

ভেরি গুড, টু অ্যানাস কপ। খালি দো-আনা, টু অ্যানাস। ঐ চা-ই গিলছে সবাই। ছোট ছোট ঠোঙায় বাদাম, তাও একআনা করে। কি রকম ঠকাচ্ছে ওদের। মনে পড়লো শান্তবীরের কথা। ও বলেছিল বাদামভাজা বিক্রি করবে। ভালোই তো।

তার সমবয়সী মেয়েদের মুখেও খৈ ফুটছে। ইংরেজীতে ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে। কোথায় শিখলো? লেখাপড়া তো শেখেনি তেমন! হাতে সব নম্বর লেখা গোল পিতলের চাকতি। কামরার দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ট্রেন থামতে না থামতে। নম্বরি চাকতি এগিয়ে দিয়ে বলছে—মে আই লুক আফটার ইওর লাগিজ সার?

অবাক চোখে গোরারা তাকাচ্ছে ওদের দিকে। হাসছে, চোখ কুঁচকে। দোলমা বুঝিয়ে দিল, ওরা রেষ্টুরেণ্ট থেকে ফিরে এসে' বকশিস দেবে মালপত্র পাহারা দেবার জন্যে। বুক কেঁপে উঠলো ওর, একটা গোরা হঠাৎ দমিনির গাল টিপে দিল। দমিনি খিলখিল করে হেসে উঠলো। নেপটি বুকের কাপড় ঠিকমত গুছিয়ে নেবার আগেই আর একজন হঠাৎ হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। নেপটি জিভ ভেঙালো। আশ্চর্য! ওরা বাধাও দিচ্ছেনা, রাগও করছে না। মনে হচ্ছে যেন খুশি হচ্ছে আরো। ছিঃ ছিঃ একটুও কি লাজলজ্জা, মানসম্মানের বালাই নেই ওদের? চারিদিকে এত লোকজন, তাদের সামনে!

ওপাশে ফুলমায়া দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখলো শাইলি। ওদের চেয়ে বয়সে বড় অনেক। বিধবা। এখনো কারো সঙ্গে যায় নি। চায়ের দোকান আছে একটা। আজ কেমন সেজেছে! চোখে কাজল, মাথায় ছুটো গন্ধরাজ, গলায় মোটা লালপুঁতির মালা। খুব পাতলা কাপড়ের ব্লাউজ, ওড়নাটাও টানেনি ভালো করে। ছুটো গোরা বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একজন চোখের ইসারা করলো। ফুলমায়া কেমন করে যেন হাসলো। এবার ওরা এগিয়ে গেল ওর দিকে। তখনো হাসছে

ফুলমায়া। ওরা তিনজন এবার মালগাড়ীর আড়ালে চলে গেল। ছিঃ ছিঃ আবার.ভাবলো শাইলি, মানুষজন কেমন বদলে গিয়েছি।

ফিসফিস করে বললো দোলমা—তুই অবাক হচ্ছিস, আমরা রোজই দেখি। ফুলমায়া বেশ রোজগার করে আজকাল। নেপটি দমিনিরও রোজগার হয়। তবে ওরা ফুলমায়ার মত নয়।

—তুইও অমন হয়ে গেছিস নাকি? ব্যথা ঝরে পড়ে শাইলির গলায়।

—নারে, এখনো হইনি। তবে হয়ত হয়ে যাব। মানুষের মন, বিশ্বাস নেই। অকস্মাৎ ঝাঁঝ ফুটে ওঠে ওর গলায়—কি লাভ ভালো থেকে? কি ফল হয় বল! না খেয়ে মরলে কেউ দেখবে না। আমাদের সতী সাবিত্তির হয়ে তো লাভ নেই কোন। কেউ প্রশংসা করবে না, ভালো বলবে না, যতই ভালো থাকনা তুই। হয়ত দুচারদিন পরে আমিও অমনি হয়ে যাব। তখন তুই আমায় ঘেন্না করবি। একটু যদি লেখাপড়া শিখতাম, চাকরি করে খেতে পারতাম। স্কুলের মেয়েরা দলে দলে চাকরি নিচ্ছে যুদ্ধে। আমরা তো আর ঐ চাকরি পাব না। আমাদের দৌড় ঐ জলাপাহাড় পর্যন্ত। তাও ঘুষ দিতে দিতে যেতে হয়।

—সে আবার কি? অবুঝ চোখ মেলে তাকায় শাইলি।

—পরে বুঝিয়ে দেব। একেবারে বোকা তুই। ঐ ছ্যাখ, সেই গোরা দুটো পয়সা দিচ্ছে নেপটি দমিনিকে।

—আর ফুলমায়া কোথায় গেল? জানতে চায় শাইলি।

—কেন, ঐ মালগাড়িগুলোর পেছনে। সময়মত আসবে। এখন তো গাড়িছাড়ার বাঁধাধরা নিয়ম নেই কোন। অনেক দেরি করে। সবাই খাবে দাবে।

প্রথম ট্রেন ছেড়ে দিল। এবার দ্বিতীয়টি ছাড়বে। তারপর তিন, চার নম্বর। ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোর কমেছে। কারো হাতে বিস্কুট, কারো হাতে আধখাওয়া রুটি, স্যাণ্ডউইচ, চীজ পনীর,

মাংস, মাছের টিন। যে যার মত জোগাড় করেছে। চেয়ে চিন্তে, মন জুগিয়ে। আবার ওরা পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেন ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে—বকশিস, বকশিস বলতে বলতে।

—ঐ ছাখ বীরধোজ কেমন খুকুরি বিক্রি করছে। একটা তুআনি বা সিকি রেখে এক কোপে তুভাগ করে ধার কত ছাখাচ্ছে। আর যার দাম আট টাকা দশ টাকা তাই তিরিশ-পঁয়ত্রিশে বিক্রি করছে। ও-ই বড়লোক হবে।

—চল এবার। দেখেশুনে মন খারাপ হয়ে যায় শাইলির। গোরাছুটো বেরিয়ে এসেছে মালগাড়ির আড়াল থেকে। ফুলমায়া আসেনি এখনো।

দমিনি নেপটি এলো ওদের কাছে। বললো দমিনি—তোরা এখানে দাঁড়িয়ে? তু, তুটাকা রোজগার হল আমাদের। ভাবলো শাইলি, বেশ তো, আমিও তো পারি অমন রোজগার করতে। ওদের চেয়ে দেখতে তো খারাপ নই আমি। তখনি শাসন করলো মনকে ছিঃ ছিঃ কী ভাবছি আমি! মনে পড়লো ফুলমায়ার কথা। না, না, এ সব ভাবতে নেই। বড় খারাপ জিনিষ। আমার অভাব কিসের? যশবীর যা রোজগার করে তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। বেশি লোভ ভালো নয়। লোভ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

ও একাই ফিরে এল ঘরে। ওরা তিনজন এল না। আসুক যখন ইচ্ছে। হুইসেল দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে এক একটা ট্রেন। সব দরজায় দাঁড়িয়ে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। লাল, শাদা মুখগুলো। হাসছে, চোখমুখের ভঙ্গি করছে, চিৎকার করছে, হাত মুখ নেড়ে বিশ্রি ইঙ্গিত করছে। মুখ ফিরিয়ে নেয় শাইলি। ওরা তাকিয়েই আছে, হাসছে।

রাত্রে একটা বাণ্ডিল নিয়ে এল যশবীর। কী আছে ওর মধ্যে, ঠিক বুঝতে পারলো না শাইলি। খুলে ফেললো যশবীর। খাকির পোষাক। ভারি বুট।

· —এবার থেকে এই ড্রেস পরবো। খুশিতে ডগমগ যশবীর— এই ভারি বুট, কেমন চমৎকার ড্রেস। যা মানাবে! এখন তো আমি পাবলিকের মাল নিই না, এই পোষাক না হলে মানাবে কেন? কাল থেকেই পরবো দেখিস। কোন কথা বললো না শাইলি। সকাল থেকেই মন ভালো নেই তার। কী এক অভিশাপ নেমেছে যেন তাদের চারিদিকে। কেমন শান্ত সুন্দর জীবন ছিল। অল্প আশা, সামান্য সুখ, কম চাহিদা। জীবন এত জটিল ছিল না। এত ঘোর প্যাঁচ ছিল না। এখন সকলেরই মনে ঐ এক জলাপাহাড়ের নেশা। মনে হয় যদি একটা ভূমিকম্প হয়ে বা কোন যাদুতে যদি রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত ঐ জলাপাহাড় তবে বাঁচা যেত। মনে শান্তি পাওয়া যেত। সবাইকে ডাকছে ঐ জলাপাহাড়। হয়ত একদিন তারও সুখের ঘর ভেঙ্গে দেবে ওই রাক্ষুসে জলাপাহাড়। তাব কত সাধ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ওই হয়ত সব সুখ-সাধ গুড়িয়ে দেবে। যশবীরকে খাবার দাবার দিয়ে কোন কথা না বলে, ভারি মনে শুয়ে পড়ল শাইলি।

—কি-রে তোর আবার কি হল? অবাক হল যশবীর।

—কিছু না, ঘুম পাচ্ছে। পাশ ফিরলো শাইলি।

বুঝতে পারলো না যশবীর, বুঝতে চাইলও না। মনে তার খুশির তুফান। সবল দুবাহু বাড়িয়ে আকর্ষণ করলো শাইলিকে। প্রতিবাদ করলো না শাইলি।

সারা শহরে সাড়া পড়ে গিয়েছে। স্কুলের উঁচু ক্লাসের মেয়েরা নাকি অনেকেই পালিয়ে গিয়েছে। মা-বাবাকে না জানিয়ে, কাউকে কিছু না বলে, ওরা কখন কোন ফাঁকে চলে যাচ্ছে জলাপাহাড়ে। ট্রেনে নয়, ট্রাকে, প্রাইভেট কারে। ওখানে গিয়ে নাম লেখাচ্ছে 'ওয়াকিতে'। তারপর ছোট করে চুল ছেঁটে, খাঁকির পোষাক পরে হাসিহাসি মুখে একদিন ট্রেনে চেপে চলে যাচ্ছে।

—এ তুই কি করলি? কেঁদে বুক চাপড়ায় অযুতির বাবা। কিসের অভাব ছিল তোর? আমার যত টাকা-কড়ি বাড়ি-ঘর সবই তো তোর। একটি মাত্র মেয়ে তুই; তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলাম। বড় হবি, মানুষ হবি। কত আশা ছিল আমাদের। এ তুই কি করলি? তোর মা কান্নাকাটি করছে।

—আঃ বাবা, চুপ কর। রুনু হুঁদেই না। কাঁদতে নেই। আমি তো একা নই, কত মেয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বললে তো যেতে দিতে না; তাই না বলেই যেতে হল। লেখাপড়া শিখেছি বলেই তো যাচ্ছি। এ কত ভাল কাজ। সেবা করব আমি, কত উপকার হবে আহত সৈন্যদের। রুগী মানুষ, দুঃখী মানুষের সেবা করা কত ভালো। তোমাদের চিঠি দেব। কত নতুন নতুন দেশ দেখবো।

—না, তুই বুঝিস না, তুই ছেলেমানুষ। আমি জানি এ মোটেই ভালো কাজ নয়। প্রথমে মনে হয় ভালো, আসলে তা নয়। মুখ বুঁজে আসে ওর।

—তুমি মিথ্যে ভাবছ বাবা, নানালোকে নানাকথা বলে। জোর দিয়ে বলে অযুতি,—আমাদের কাজ সম্মানের কাজ। মাকে বুঝিও। আমি ভেবেছিলাম, মা স্টেশনে আসবে।

ইঞ্জিন হুইসেল দিল, গার্ড বাঁশি বাজালো। করুণ চোখে চেয়ে আছে অযুতির বাবা। অযুতি হাসছে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। ক্রমশঃ চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল ট্রেন।

সব দেখলো, সব শুনলো শাইলি। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক মোচড় দিয়ে।

— চল দোলমা, আর ভাল লাগছে না।

—চল। দোলমাও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে আজ।

সমস্ত দিন সবকাজের মধ্যেই অযুতির মুখটা মনে পড়ছে শাইলির। কেমন হাসিখুশি ভাব, কত আশা ওর মনে। ভালো হলেই ভালো।

কিন্তু···মনে হচ্ছে, হয়ত যতটা ভালো ও মনে করছে ততটা ভালো নয় ও কাজ। তা হলে ওর বাবা অমন বুক চাপড়ে কাঁদবে কেন? মনে পড়ছে, কতদিন দেখেছে এদের দল বেঁধে স্কুলে যেতে। দেখতে কত ভালো লাগত। ছজন, সাতজন একসঙ্গে কত সেজেগুজে গল্প করতে করতে পথ মাড়িয়ে যেতো আসতো। চোখে কাজল, রঙিন শাড়ি, চোলি ঘড়ারা; বিনুনীর কত বাহার, খোঁপায় ফুল। এই পনের ষোল বছরের মেয়েরা ভারি সুন্দর। যেমন চেহারার চেকনাই, তেমনি স্ফূর্তিবাজ। পৃথিবীর কোন দুঃখই ওদের ছুঁতে পাবে না। এই অযুতির কী চুল ছিল। পিট ছাপিয়ে হাটুতে নামতো। কোন চুল বাধতে দেখেনি ওকে। কালো চুলের বোঝা ছড়িয়ে থাকতো। আর আজ ঘাড় পর্যন্ত চুল ছাঁটা তার। কী করে পারলো অমন সুন্দর চুল কেটে ফেলতে! একটুও মায়াদয়া নেই।

চায়েব জল চাপালো শাইলি। যশবীব তো আসবে রাত্রে। শান্তবীর এখন মহাব্যস্ত। খুব বাদাম বিক্রি করছে। বেশ লাভ হচ্ছে। এখন আর মটর পবিষ্কাব করে না।

প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো দোলমা। পেছনে এলো যন্তরে বাজে। দুহাতে শাইলিকে জড়িয়ে ধরে হু-হু কেঁদে উঠলো দোলমা।

সর্বনাশ হয়েছে রে। আমি জানতাম এমন হবে। দমিনি চলে গেছে।

—কোথায়? আঁতকে উঠলো শাইলি। এই ত পরশু দেখা হল ওর সঙ্গে। এর মধ্যে কি হল আবার! বলেও নিত কিছু।

—একটু চা খাওয়া তো নানি। যন্তরে বসে পড়লে চৌকিতে। শাইলি লক্ষ্য করলো, ওর মুখও অন্ধকার।

চোখ দিয়ে জল ঝরলো দোলমার—এবার ঠিক মরে যাবে ও। আমি জানতাম এমনি সর্বনাশ করবে একদিন। কাল রাত্রে খোঁজ

করেছি, ঘরে আসেনি। ভাবলাম আছে কোথাও। আজ এই মাত্র যন্তরে বাজের কাছে শুনলাম, ও চলে গেছে জলাপাহাড়। এখন থেকে ওখানেই থাকবে। ওখানে সব ছোট ছোট ঘর করেছে অনেক। সেখানেই থাকবে। আরো অনেক মেয়ে গিয়েছে।

শুনে কাঠ হয়ে গেল শাইলি। বুক কাঁপছে তার। এতটুকু ভয়ডর নেই দমিনিব ? নিজে সেধে ওখানে গেল ? ঐ গোরাদেব মধ্যে ? সর্বনাশ কবেছে ঐ জলাপাহাড। সবাইকে ডেকে নেবে এক এক কবে। কাউকে ছাড়বে না, কাউকে না।

—মিছে ভাবছিস তোবা, আস্তে আস্তে বলে যন্তরে—যাব যা কপালে আছে তাই হবে। কেউ ঠেকাতে পাববে না। দমিনির ও ছাড়া উপায় ছিল না। এই তো সকালে আমায় বললো ধনশিঙ, ও নিজে দেখে এসেছে দমিনিকে কাল সন্ধ্যাবেলায়। ধনশিঙ ওখানে কনট্রাকটবি পেয়েছে। ওকে দেখে মুখ লুকিয়ে বইল দমিনি। কোন কথা বলেনি। তোবা আব ভেবে কি কববি ? নে চা খাওয়া। বোস দোলমা। কাঁদিস নে আব।

চা তৈরি করে শাইলি। তিন জনে বসে চা খায়। কাবো মুখে কোন কথা নেই। উদাস চোখে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যন্তবে।

—কত ভালো ছিলাম আমবা। যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমন মৃদুস্বরে প্রায় আপনমনে বলে চলে যন্তবে। এই পাহাড়ে আমাদের দুঃখ কষ্ট অভাব কত কম ছিল। এখানে কোন বোগ নেই। এক আছে শুখেকাস। তবু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। যে যার মত খেটে খাই, কাজ কবি। অল্প খাওয়া দাওয়া হলেই আমরা খুশি। কোন ঝামেলা ছিল না। তারপর একে একে অন্য জায়গার লোকজন এসে এখানে থাকতে আরম্ভ করলো। এমন দেশ কি আছে কোথাও ? এই মেঘ-পাহাড়-ঝর্ণা, টাটকা শাকশবজি, খাঁটি ঘি-দুধ, যে একবার এসেছে, সে আর

ফিরে যেতে চায়নি। গরমি দেশের লোকেরা দলে দলে আসতে আরম্ভ করলো। চাকরি নিল, ব্যবসা আরম্ভ করলো, আর আমাদের চাকর বানিয়ে রাখলো। আমরা ধর্মভীরু, বোকা, সরল, বিশ্বাসী জাত ছিলাম। ওরাই বলে। ইস্কুল করলো, আমাদের সেখানে পড়তে দিল না। সাহেবরা চা বাগান কিনলো, আমাদের ছেলে-মেয়ে সবাইকে কুলি বানালো, চৌকিদার করলো। আমরা সত্যি কথা বলি, সাহসী, অল্পে খুশি হই, তাই ওরা আমাদের দিয়ে যা খুশি তাই করাতে আরম্ভ করলো। আমরা পোষা কুকুরের মত ওদের পায়ে পায়ে ঘুরি, লাথি খেয়ে কেঁউ-কেঁউ করে ল্যাজ নেড়ে ওদের পায়েই লুটিয়ে পড়ি। যে খুকুরি দিয়ে এক কোপে বাঘভালুক কাটতাম, সেটা দিয়ে উনুন ধরাবার কাট কাটি, না হয় কোমরে গুঁজে রাখি, একটা অকেজো ভারি গয়নাব মত।

কোন কথা, নেই ওদের মুখে। কথায় পেয়েছে যন্তরে বাজেকে। আপনমনে বলে চলেছে সে, ওরা দুজন শুনছে মন দিয়ে। বেশ লাগছে যন্তরে বাজের কথাগুলো। প্রায় সবই জানা কথা, শোনা কথা তবু যেন নতুন মনে হচ্ছে।

—এই জীবনে কত লোক দেখলাম, কত রকমের। কত অদলবদল দেখলাম দুনিয়ার। প্রথম ট্রেন চললো পাহাড়ে, তখন আমি পাহাড় কেটেছি গাঁইতি কোদাল চালিয়ে। আমরাই হলাম ড্রাইভার-ফায়ারম্যান-তেলঅলা-বিরিকম্যান। যত কঠিন কাজ, ঝক্কির সব কাজ আমাদের ঘাড়ে পড়লো। তিনধারিয়ায় তৈরি হল কারখানা। সেখানেও আমরাই মার্তুল চালিয়ে হাত-পা কেটে গাড়ি বানাই। আমাদেব জ্ঞানের কোন দাম নেই। আমাদের ওরা বলে, মূর্খ অশিক্ষিত পাহাড়ি ভূত। তারপর সেই চোদ্দ সালের লড়াই সুরু হোল, তখনো আমাদের ছেলেরা দলে দলে যুদ্ধে গেল। অংরেজরা বললো—গুর্খাদের মত এমন সাহসী, শক্তিশালী পল্টন দুনিয়ায় নেই, ওরা মরতে ভয় পায় না, লড়তে জানে বীরের মতো।

তাতেই আমরা খুশি। কিন্তু কজন সুস্থ দেহে ফিরে এলো ? ধক্ করে জ্বলে উঠলো বৃদ্ধ যন্তরে বাজের নিষ্প্রভ চোখ দুটো।

—চারিদিকে শুধু বিধবার ভিড়। খেতে পায় না। একপাল ছেলেমেয়ে সেই আমাদের সমাজে ভাঙন সুরু হোল। তার আগে এত দুঃখ কষ্ট ছিল না। পেটের তাগিদে, আমাদের সমাজের শাসন ভেঙ্গে, যে যেখানে পারলো ছুটলো। ছেলেমেয়েরা ভেসে গেল! এক একজনের ঘরে তিনটে চারটে বৌ, ঝগড়াঝাটি খুনোখুনি। সব সুখশান্তি নষ্ট হোল। বাগানের সাহেবরাও যা ইচ্ছে তাই আরম্ভ করলো। মেয়েরা তাদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে উঠলো। মাতব্বর চৌকিদারদের টাকা দিয়ে হাত করে, মদ খাইয়ে বশ করে ছিনিমিনি খেলতে আরম্ভ করলো মেয়েদের জীবন নিয়ে। কত ছেলেমেয়ে হোল। তারা সব পথের ছেলেমেয়ে। না আছে ঘর, না বাপ। কোন পরিচয় নেই তাদের। মিশ্‌নারী সাহেবেরা আশ্রম তৈরি করে সেখানে থাকতে দিল অনেককে। সবাই তো আর জায়গা পেল না! কানা, খোড়া, অন্ধ, রুগী সব পথেই ছড়িয়ে রইলো। যারা বড় হচ্ছে তাদের ধরে ধরে সব খৃষ্টান করতে আরম্ভ করলো মিশ্‌নারী সাহেবরা। কে বাধা দেবে ? দিলেই বা শুনছে কে ? অংরেজ রাজা আমাদের। যা খুশি করতে পারে ওরা।

একটু দম নিল যন্তরে। চায়ের গেলাস অনেকক্ষণ খালি হয়ে গিয়েছে। কথার নেশায় পেয়েছে আজ ওকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছে ওরা দুজন। কত জানে এই বুড়ো বাজে। ও থামতেই বলে দোলমা,—

—তারপর বাজে ? থামলে কেন ?

—আবার দিন ফিরলো। যারা লড়াই থেকে ফিরে এসেছে তারা নতুন দুনিয়া দেখে এসেছে। অনেক জেনেছে বুজেছে। জেনেছে মুখ বুজে যত সইবে, কাঁধে তত বোঝা বাড়বে। ওরা ঘা

খাওয়া পোড় খাওয়া লোক। সমাজকে নতুন করে গড়বার চেষ্টা করলো ওরা। লেখাপড়া শেখানোর জন্যে তোড়জোড় সুরু করলো। বুঝিয়ে দিল—চিরকাল পায়ের নিচে পড়ে থেকে চাকরের মত জীবন কাটাবার জন্যে জন্মাইনি আমরা। আমরা সবাই মানুষ, আমাদের ত ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচবার অধিকার আছে। লেখাপড়া শিখে বড় হবার অধিকার আছে। আমরা সব কাজে যোগ দিতে পারি। কেন পেছনে পড়ে থাকব চিরদিন? আমাদের সবাই ঘেন্না করে, দয়া করে, সে আমরা চাইনা।

এবার সুরু হোল লেখাপড়া শেখা। তাও কত চেষ্টা করে, কষ্ট করে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে হয়। কিন্তু ভালো হোল। আমাদের ছেলেরা এক এক করে অনেকে চাকরি পেল অফিসে। খরশাঙের এই বিরাট রেল-অফিসে ঢুকলো অনেকে। তিনধারের লোকো অফিস, ইষ্টোর-অফিসে গেল। আর ইষ্টিশনের টালি-ক্লার্ক, সিগনালার, এ, এস, এম, মালবাবু, পারসেলবাবুর কাজও পেল। গাড়ির গার্ড,-টিটি হোল কেউ বা। ভদ্রলোকদের সঙ্গে এক সাথে পাশাপাশি সব কাজে লাগলো ওরা। পারবে না কেন? সবাই তো মানুষ, বুদ্ধি আছে, শুধু ঠিক মত খাটানোর দরকার। এতদিন জোর করে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, তাই তারা অন্ধকারে।

এই শহরের চেহারাই বদলে গেল। আগে যেমন ঘরে ঘরে যেন রোগ পুষে রাখতো সবাই, কেউ হাসপাতালে দিতে চাইত না—এখন সব ভুল বুঝতে আরম্ভ করলো। ছোট ছেলেমেয়ে মা বাবা সবাই এক সঙ্গে বিড়ি, সিগ্রেট, মদ খেত সে সব কমে যেতে আরম্ভ করলো। আমরা যেন নতুন আলো দেখলাম। কিন্তু আবার এই ভালো করে গড়ে ওঠবার সুরুতেই ভাঙ্গন ধরলো আমাদের সমাজে। কোথায় সেই অংরেজরা যুদ্ধ করবে—তার ফল ভোগ করতে হবে আমাদের! কি লাভ আমাদের? দুটো কাঁচা টাকার লোভে, একটু ফুর্তির লোভে সব ভেসে গেল, দেশ

ভেঙ্গে গেল। কে বুঝবে বল, কাকে বোঝাব আমরা? তাদের চোখে এখন রঙের নেশা, যুদ্ধের নেশা। পাহাড়ি তো, প্রকৃতির ঝড়বাদলের সঙ্গে, বাঘভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভ্যাস ছিল, এখন মানুষের রক্তের নেশা ওদের মাতাল করেছে। এখন ভালো কথা তো কানে যাবে না। বলে বুড়োর মাথা খারাপ হয়েছে। তাই কাউকে কিছু বলি না। শুধু চুপ করে দেখি, দেখে মুখ বুজে পড়ে থাকি। শুধু আজ তোদের এখানে মুখ খুললাম। তাও ঐ ছুঁড়ি দমনিটার জন্যে। এতক্ষণে চোখ মুছলো যন্তরে বাজে।

—বেলা হল আজ উঠি। উঠে দাঁড়ালো যন্তরে।

—তুমি যাও। এখন আমি এখানেই থাকি। বললো দোলমা।

মে মাস যেতে না যেতেই আরম্ভ হয় মৌসুমী হাওয়া। দূর ঝর্ণার জলে সূর্যের তাপ পড়ে, বাষ্প উঠে আসে সোঁ সোঁ করে। শাদা কুয়াশা ফুরফুরিয়ে ওড়ে। এসে ধাক্কা খায় উঁচু পাহাড়ে। মেঘের পর মেঘ জমে। শাদা মেঘের ওপর মেঘ জমে রঙ কালো হয়। মনে হয় দলবেঁধে শিকারী বাজপাখি ওঁৎ পেতে বসে আছে। এই ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে। ঈশান কোণের আকাশ পীচ কালো হয়ে ওঠে।

জুনেই নামে। একসঙ্গে দলবেঁধে সবকটি বাজপাখি ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্ধকার। দিনেরাতে তফাৎ থাকে না। ছিঁচকাদুনে মেয়ের একঘেয়ে নাকিসুরে কান্নার মত। বিরক্তিকর। এই থামলো, আবার যখন খুশি এসে পড়লেই হল। শুকনো ঝরণায় ঢল নামে। গেরুয়া জলের রাশি তীরবেগে-ছুটে চলে। কত বড় পাথর হারিয়ে যায় ওদের আড়ালে। গেরুয়া জলের পর শাদা জল। পাথরে ঘা খেয়ে খেয়ে ছুটে চলে জলধারা। এখানে ওখানে মাটি ফুঁড়ে নতুন ঝরণা দেখা দেয়। ধস্ নামে পাহাড়ে। একটি দুটি নয়, অজস্র ছোট ছোট ধস, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ঘণ্টা দুচার কোদাল-গাঁইতি চালিয়ে ঠিক করা যায়। কোনটি বা বেশ বড়। দিনরাত কাজ চলে। ঝুপঝাপ ঝুপঝাপ কোদাল-শাবল চলে। ডিনামাইট

ফাটে পাহাড় কাঁপিয়ে। রেললাইন, মটরওয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গভীর গহ্বর। মনেই হবে না যে কোনকালে ওখানে পথ ছিল কোন। মাটি পাথর ফুঁড়ে গেরুয়া জল নামে।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর, পাকা চারমাস বৃষ্টি। পাহাড়ি বর্ষায় ধস নামে পাহাড়ে, বন্যা হয় সমতল ভূমিতে। মাঠ-নদী-বন একাকার হয়ে যায়। বড় বড় পাথরের ফাটলে জল জমে। সেই জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, বড় বড় পাথরের চাঁই ভেঙে পড়ে। গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন করে বাড়িঘর পথ বাগান। রুদ্রের এই তাণ্ডবমূর্তি বছরের পর বছর চলে। প্রাণহানি হয় কত। অসুবিধে হয় যাত্রীদের। গিদ্দাপাহাড়, পাগলাঝোরা, তিনধারিয়া, লুপ-টু, কত বড় ধস নামে এইসব জায়গায়। ওগুলো ডেঞ্জার জোন। বৃষ্টি হলেই বুক কাঁপে ইঞ্জিনীয়ারদের। এই বুঝি ফোন এলো! রাত হোক যত, তখুনি ছুটতে হবে। খবর পাঠাতে হবে সর্দারদের, তারা জানাবে বৈদারদের। বৈদাররা কুলি ঠিক করে রাখে। দলবল নিয়ে ছোটে। তারা যেন ওঁৎপেতে থাকে। মুহূর্ত গোণে, কখন ডাক আসবে। ছুট ছুট, এক সেকেণ্ড দেরি নয়।

রেষ্ট ডে ছিল যশবীরের। ভোরে উঠে আধ সের মাংস কিনে এনেছে। এক বোতল রকশিও রেখে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টি, মাংসের পর জমবে ভালো। শান্তবীরকে বলে দিয়েছে, আজ ছুপুরে ভাত খেয়ে যেন আবার ষ্টেশনে চলে যায় ও।

বেলা দশটাতেই বাইরের দরজায় ভারি জুতোর শব্দ।

—যশবীর আছিস নাকি?

ভুরু কোঁচকালো যশবীর। এ তো চন্দ্রবীরের গলা। ও আবার এলো কেন? তবু বাইরে এলো যশবীর।

—এই যে বৈদার, হঠাৎ এখানে। হাসিমুখে সম্ভাষণ জানালো।

—এই এলাম তোমাদের খোঁজখবর নিতে। এখন তো দেখাই পাওয়া যায় না। চলো বসি, কথাবার্তা আছে।

ভেতরে এসে বসলো ওরা।

—বৈদারকে চা খাওয়া শাইলি। হাঁক দিলো যশবীর।

পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করে এগিয়ে দিল চন্দ্রবীর। নিজেও ধরালো একটা।

—তুইতো খুব বড়লোক হয়েছিস যশে, দু-তিন ট্রিপ মারছিস দিনে। দেখা না হলেও খবর পাই। দুচোখ বুঁজে হাসলো চন্দ্রবীর। ওর মোটা গোঁফ জোড়া কেঁপে উঠলো। ঠিক যেন বেড়ালের ল্যাজ। শিকার দেখলে যেমন করে কাঁপে। বুঝলো যশবীর, নিশ্চয়ই কোন মতলব নিয়ে এসেছে চন্দ্রবীর। ও এমনি আসে নি। অত সময় নেই ওর। আসল কথাটা পাড়ে কখন দেখা যাক।

শাইলি কান খাড়া করে রইলো। কি কথা হয় ওদেব মধ্যে শোনার কৌতূহল কম নয়। চা হয়ে এলো বলে। একটু পরেই পাতি ভিজিয়ে দেবে। কড়া লিকাবে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো।

—এবাব তো বর্ষা বেশ তাড়াতাড়ি নামলো যশে। চোখ বুঁজে কড়া সস্তা সিগারেটে টান দিয়ে খুক খুকিয়ে কাশলো চন্দ্রবীর। এবারে চোখদুটি মিটমিটিয়ে তাকালো যশবীরের মুখের দিকে।

—আমার হয়েছে মুস্কিল। দুচারদিনের মধ্যেই তো ছোটবড় অনেকগুলো 'পইরো' নামবে। পথঘাট ভেঙে পড়বে। কিন্তু লোক পাচ্ছি না একদম। যত মেয়ের দল গিয়ে জুটেছে জলাপাহাড়ে। কাঁচাপয়সা আর ফুর্তির লোভে। জোয়ানরা গেছে পল্টনে। হাতে আছে শুধু বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। তা তারাও গোরাদের কাছে চা-বাদাম বিক্রি করছে। আমি কি করি বল্‌তো! অসহায় শোনালো চন্দ্রবীরের গলা।—অথচ এই শনিবারের ভেতরে যে কোন রকমে আমায় দেড়শ কুলি জোগাড় করতেই হবে। নইলে সর্দার তারাশিঙ খেয়ে ফেলবে। আমাব এই তিরিশ বছরের কাজ যাবে। তুই, তুই আমার একটা উপায় করে দে। এবার ওর দুহাত চেপে ধরলো চন্দ্রবীর—তুই শাইলিকে দে, ও কাজ করুক আমার

ওখানে। ও গেলে দোলমাও যাবে। ছাখ, ভাগ্য কাকে বলে! বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে কয়েও লোক জোগাড় করতে পারছি না। মুখের ওপর সবাই বলছে, যাবো না। অত অল্প পয়সায় কাজ করবো না। অথচ আমি দশ আনা থেকে তেরো আনা রোজ দিতে রাজি হয়েছি। তুই তো জানিস, একদিন এই কাজের জন্যে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়তো ওরা। হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতো। রকশি ষাঁড় খুষ দিত, এমন কি কুমারী-বৌ-রাঁড়ি আমার সঙ্গে শুতেও আপত্তি করেনি। আর আজ দূর দূর করে ছায়। বলে, আমরা ওর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করি। একি আমার টাকা? সব দিলে হাতে কি থাকে বল?

—হুঁ, মুখটিপে হাসলো যশবীর,—যা দিনকাল পড়েছে, তের আনা খুব কম। তুমি তো দেড় টাকা করে পাও।

—তা, সবার জন্যে কি আর তের আনা! ব্যস্ত হয়ে উঠলো চন্দ্রবীর। গোঁফজোড়া আরো জোর নেচে উঠলো।—শাইলি যদি যায়, ওকে আর দোলমাকে পুরো টাকাই না হয় দেব। কাউকে বলিস না যেন। অত দিলে কি-ই বা থাকে আমার হাতে?

এপাশ থেকে ওপাশে মাথা নাড়ে শাইলি—কিন্তু না, শাইলি তো যাবে না।

—অ্যাঁ। চমকে ওঠে চন্দ্রবীর। হাতের গেলাস থেকে প্রায় চলকে ওঠে চা। সে কিরে! এর চেয়ে বেশি কি দেওয়া যায়? হতাশ কণ্ঠ ওর।

—উঁহু, দুটাকা দিলেও নয়। ও যাবে না। আমি যা কামাই করি তাতে দুজনের খুব ভালোভাবেই চলে যায়। এখন দুতিন ট্রিপ দিচ্ছি ডেলী। অনেকদিন অভ্যেস নেই ওর। সুখে থাকতে কষ্ট করবে কেন? একটু থামলো যশবীর—তাছাড়া ওঁর শরীরও ভালো নয়।

মুখ চুপসে গেল চন্দ্রবীরের। সে এতটা আশা করেনি।

ভেবেছিল এক টাকার টোপ নির্ঘাৎ গিলবে যশবীর। ও-যে এত গভীর জলে, ডুব মেরেছে তা সে ভাবতে পারেনি। শাইলিও খুশি হলো শুনে। সে আর কাছে এলো না।

—ভেবে ছাখ, তোরা নেহাৎ নিজের লোক বলেই টাকা টাকা রোজ দিতে রাজি হয়েছিলাম। তিনদিন টাইম আছে হাতে, ভেবে দেখিস। মুখ ভার করে উঠে দাঁড়ালো চন্দ্রবীর।

—না বৈদার, ভাববার কিছু নেই। বললো যশবীর।

—তা বৈকি, তোরা বেইমান, নেমকহারাম। পুরোনো দিন সব ভুলে গেছিস তো! গটগট করে বেরিয়ে গেল চন্দ্রবীর। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো যশবীর। খুব রেগেছে বৈদার। রাগুক। বাড়ি গিয়ে বেশি ভাত খাবে।

কখনো কি ভোলা যায়, না ভোলা এত সহজ? যশবীরও নয়, শাইলিও নয়। কেউ ভোলেনি। মাঝের থেকে দিনটা মাটি হয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল। রেষ্ট প্রায় পায়ই না। তা একটা দিন বেশ আনন্দে ফূর্তিতে কাটাবার পরিকল্পনা আগের থেকেই করে রাখে। কিন্তু আজ ঐ মুখপোড়া বৈদারটা সব মাটি করে দিল। কি দরকার ছিল সাতসকালে আসবার!

রকশিও বিস্বাদ লাগে যশবীরের। একপেট মাংস খেয়ে পুরো বোতল রকশি টেনে শুয়ে পড়ে বিছানায়। মৌতাত জমতে দেরি হবে না। কথাবার্তা না বলাই ভালো। একে মেজাজ ঠিক নেই, তার ওপর কোন সাধারণ কথা থেকে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যাবে। শেষে শাইলিকে মারধোর আরম্ভ করবে। ওর চিৎকারে পাড়া মাত হবে। প্রতিবেশীরা ছুটে আসবে। বোঝাবে, বকবে, গালাগাল্ল দেবে। তার চেয়ে চুপচাপ ঝিম মেরে পড়ে থাকা ভালো। শাইলি নিজের থেকে পাশে এসে শোয় ভালো। না হলে সে আর ডাকবে না আজ। টানটান হয়ে চোখ বোজে

যশবীর। যতদূর মনে হয় শাইলি নিজেই আসবে। এমন একটা ছুটির দিন কি ও ব্যর্থ হতে দেবে ? তাছাড়া শান্তবীর একফাঁকে এসে খেয়েদেয়ে চলে গেছে। সেই সন্ধ্যার আগে আসবে না আর।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসনমেজে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল শাইলির। খুব আস্তে, শব্দ না করে এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়েছে যশবীর। নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে সোঁ সোঁ। একবার ভাবলো ডাকবে কিনা। নাঃ ডেকে কাজ নেই। হয়ত একটু পরে নিজের থেকেই জাগবে। সেই ভালো। বরঞ্চ যতক্ষণ পারা যায় চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া যাক।

ওর চোখে ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ করলো কিছুক্ষণ। ঝির ঝির বৃষ্টি সুরু হয়েছে। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না। শীত শীত করছে। পুরোনো লেপটা ছিঁড়ে গেছে। বিশ্রী একটা বোঁটকা গন্ধ আসছে নাকে। আর চলে না। এবার এঁটা বদলাতে হবে। প্রায়ই ভাবে, বলবে যশবীরকে। কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না।

হ্যাঁ, এখনো মনে পড়ে। প্রায়ই। ভোলা যায় কি সে সব দিনের কথা। এই চন্দ্রবীর বৈদারের কি দাপট তখন। যেমন বিশাল চেহারা, তেমনি হাঁক-ডাঁক। সবাই ওর ভয়ে মরে। সর্দারের চেয়েও ওকে ভয় বেশি। বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর লোকটা। এ অঞ্চলের সবাই জানে ওকে, চেনে ভালো করে। ওর অত্যাচারে জর্জরিত হলেও মনে মনে প্রতিবাদ করে মাত্র। প্রকাশ্যে কিছু বলার বা করার সাহস হয় না কারো। ভাবতে শিউরে ওঠে শাইলি। শুনচেরির তখন আটমাস। ঐ অবস্থাতেই সে কাজে যেত। ভারি গরীব আর ভালো মেয়ে। ওর বর ছিল লাইনে খালাশি। রোজগার কম, তাই ওকে কাজে যেতে হোত। বাড়িতে অন্ধ শ্বশুর। চুপচাপ মেয়েটা, কথাবার্তা বলে না। তারই ওপর চোখ পড়লো চন্দ্রবীরের। কত কান্নাকাটি, হাতে-পায়ে ধরা, তবু শোনে না। শয়তান, ঐ অবস্থাতেই ওকে নষ্ট করলো। ওখানেই

বাচ্চা হোল শুনচেরির। কিছুক্ষণ কেঁদেকেটে বাচ্চাটা মরে গেল। আর অজ্ঞান অবস্থায় ওকে নেয়া হোল তিনধারিয়া হাসপাতালে। প্রাণে বেঁচে গেল শুনচেরি। সেদিন সবাই ক্ষেপে উঠেছিল। হাতের কাছে পেলে হয়তো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতো চন্দ্রবীরকে। কিন্তু বেশ কিছুদিন কোথায় যেন ডুব মেরে রইলো। গরীব খেটে-খাওয়া মানুষের দল আর কদিন রাগ পুষে রাখবে? ভুলে গেল ক্রমশঃ। ক্ষমা করে দিল ও পশুটাকে। এখনো চোখ বুঁজলে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পায় শাইলি। সে কী রক্তের বন্যা!

সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে ওরা, কবে বৃষ্টি নামবে। দিনের পর দিন, পাঁচ-ছদিন বৃষ্টি হবে একটানা। আকাশ অন্ধকার, দিনেরাতে তফাৎ থাকবে না কোন। ঝর্ণায় জল ছুটবে, নতুন নতুন ঝরণা ফুটে বেরোবো পাহাড়ের গা দিয়ে। হুড়মুড় করে পাহাড় ভেঙে পড়বে। ট্রেন-লাইন, মোটর-রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চারিদিকে এক রব, পইরো গয়ো, পইরো। ট্রেন বন্ধ হবে, ট্র্যানশিপমেণ্ট হবে। যাত্রীরা হা-হুতাশ করবে, চিৎকার করবে। আর ওদের আনন্দ তখন দেখে কে। বসে বসে হাত পা প্রায় অবশ হয়ে গেছলো। এতদিনে একটু হাত-পা খেলাবার সময় হল। কাজ করবে, খাটবে, খাবে। পয়সা জমাবে। এই এক একটা ধস্ তাদের জীবনকে ভাঙে আর গড়ে। কত নতুন ঘর বাঁধা হয়, পুরোনো ঘর যায় ভেঙে। কত হাসি আর কান্না, খুনজখম, মারামারি। এক একটা পইরো এসে তাদের জীবনকে ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করে দিয়ে যায়, তবু ওরা ভালোবাসে পইরোকে। মনেপ্রাণে কামনা করে, এবার যেন খুব বৃষ্টি হয়, পাহাড় ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়। নইলে আমরা বাঁচবো কি করে? কাজ পাব কোথায়?

খুব ভোরে দলবেঁধে ওরা রওনা হয়। এরই মধ্যে প্রসাধন সেরে নিতে হয়। চোখের কোণে কাজল, খোঁপায় ফুল। ঠোঁটের

কোণে বাঁকা হাসি। ট্রেন ছাড়ে, কিন্তু ওরা ওঠে না। ড্রাইভারগুলো এতো পাজি ঠিক জায়গামত গাড়ি এতো জোরে চালাবে যে লাফিয়ে নামা যাবে না। তাহলে হাত-পা ভাঙবে। হয়ত মাইল-খানেক দূরে গিয়ে দাঁড় করাবে গাড়ি। তখন কিছু বলতে গেলে খিল-খিলিয়ে হাসবে। তারচেয়ে ভালো ট্রাকগুলো। ওরা বেশ নিয়ে যায়। একটা পান খাওয়ালে, একটু হাসলে, চোখ নাচালে কাজ হাসিল হয়। গায়ে গায়ে বসলে তো কথাই নেই। ফিরতি পথেও ঠিক নিয়ে আসবে। তখনি দরকার বেশি। সারাদিন খেটে শরীর ক্লান্ত থাকে। আর ইচ্ছে করে না হাটতে। পা ধরে আসে। তবু একসঙ্গে দল বেঁধে গান গল্প হাসিতে পথের পরিশ্রম কমায়। সকালে যাবার সময় তেমন কষ্ট হয় না। পিঠে ডোকো ঝোলো, তারমধ্যে একবোতল চা আর দুপুরের খাবার—ঠাণ্ডা ভাত, একটু নুন, একটা পেঁয়াজ, দুটো খর্সানি আর একমুঠ রাঁই বা মুলোশাক। এই ভাগাভাগি করে, হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে খেয়ে নেয় ওরা। এতটুকু অসুবিধে হয় না।

খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। এবার নাকি খুব বড় ধস্ নেমেছে লুপ-টুতে। বছর কয়েকের মধ্যে অতবড় ধস্ নাকি নামেনি। ওখানেই এবার সব কুলি লাগবে। হাজাব কয়েক। অন্য ছোটখাট ধস্ দুচার ঘণ্টায় বা এক-দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে। বৈদারকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। এবাব দুবোতল রকশি নিয়ে গিয়ে দেখা করলো।

—কি রে এসেছিস! বোতলদুটো হাতে নিয়ে হাসে বৈদার—কাল থেকেই কাজে লেগে যাবি। ওর ফুলোফুলো গালদুটো টিপে দেয়।

—আইয়া! ব্যথা পায় শাইলি। চোখ বড় করে তাকায়। হঠাৎ ওকে দুহাতে ধরে কোলের ওপর বসিয়ে দুগালে চুমো খেতে আরম্ভ করে বৈদার—কতি রামরো, কতি মিঠো।

বাধা দিতে চেষ্টা করে শাইলি। ডানা ঝটপট করে থেমে যায়। বৈদারের শক্ত দুহাতের বাঁধন আলগা করতে পারে না। চিৎকার করে লাভ নেই জানে। তাহলে আর কাজ পাবে না। ফরসা মুখ রঙিন হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরে উত্তাপ। দাহ। এবার বৈদার উঠে দাঁড়িয়ে ওর ছোট দেহটা বুকে চেপে কঠিন পেশনে পিশে ফেলে।

যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে শাইলি। চিঁ চিঁ করে বলে—ভয়ো, ছোড়ি দেও, দুখ দেইছ।

—কোন কাজের নস তোরা। একটুতেই ব্যথা লাগে। ছেড়ে দেয় বৈদার। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে শাইলি। সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে গেছে। কী জোর বাপু। বাঘের মত শক্তি দেহে। এর অর্ধেকও নেই শুকুলালের।

—ভোলি দেখি কামমা আউন্নু। হেসে বলে বৈদার। এবার চাপা স্বরে ফিসফিসিয়ে বলে—মাঝে মাঝে কিন্তু আমায় রকশি খাওয়াতে হবে। একটা বোতল খুলে হড়হড় করে সবটা তরল পানীয় গলায় ঢেলে দেয়—আসবি তো মাঝে মাঝে ?

—হুঁ। ঘাড় নেড়ে হেসে বেরিয়ে যায় শাইলি। বাঁচা গেল। একঠা পশু যেন। দুদুটো বউ, একপাল ছেলেমেয়ে, তবু বুড়োর লোভ যায় না। ওর তিনটে মেয়ে তো আমার চেয়েও বড়।

দলবেঁধে ছেলেরা আসে সকালে। বয়সে সবাই ছোট। দমাই, তোরমে, হপ্ পে তুনে, লালে, গঠে, কালে, শিঙে—পাড়ার ছেলের দল কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। এরা পাতি টিপতো বাগানে। এখন আর যাবে না। পাতি টেপার কাজও মাস তিনেক নেই। তৈরি হয়েই ছিল শাইলি। ওরা বাইরে থেকে ডাক দিলো—ছিট্টো আউ শাইলিদিদি, ঢিলো ভয়ে বনে গাড়ি পাঁউদেইনা।

একগাল হেসে বাইরে আসে শাইলি। তারপর রওনা হয়। পথে বুধু, মাইলি, কালি, ইয়াংরি সঙ্গ নেয়। গল্পে হাসিতে চিৎকারে পথ মাতিয়ে ওরা ষ্টেশনে এসে পৌছয়। এবার অনেক দূরের পথ,

তাই ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। দুদিক থেকেই কুলি বোঝাই ট্রেন যাবে সকালে, আবার ফিরবে সন্ধ্যায়। এত দূরের পথ হেঁটে যাওয়া কঠিন। যারা কাছেয় থেকে যাবে, তারা অবশ্যি হেঁটেই যাবে।

দেখে অবাক হয় শাইলি। চেনাই যায় না। কিছুক্ষণ মুখে কথা ফোটে না। তার জীবনে এতবড় পইরো দেখেনি কখনো। শুনেছে, সে যখন খুব ছোট, তখন পাগলাঝোবায় খুব বড় পইরো হয়েছিল। কিন্তু সেটা কি এতবড়।

চূনাভাটি ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক গেলেই লুপ-টু। দুনম্বর লুপ। এখানকার সবচেয়ে বড় লুপ। ঐ লুপের বাঁক ঘুরে ট্রেন যায় রঙটঙ; তারপর শুকনা হয়ে শিলিগুড়ি। পাহাড়ের শেষ কোণে এখ লুপ। পাহাড় পেঁচিয়ে ট্রেন লাইন গিয়েছে। কিন্তু এখন আর তার কোন চিহ্ন নেই। গোটা পাহাড় বসে গিয়েছে। এখন শুধু বিরাট এক গহ্বর। এমনি ধস্ নামলে কিছুটা পাহাড়ের মাটি কেটে, নিচের থেকে গেঁথে তার ওপর সিমেণ্টের বস্তা, ছাইয়ের বস্তা চাপিয়ে স্লিপার ফেলে ট্রেন-লাইন পাতা হয়। তার ঢালু দেয়ালে গাছেব ডাল লাগানো হয়, যাতে মাটি সরে না যায়। কিন্তু এবার আর তেমন কোন উপায় নেই। হাজার-দুহাজাব ফুট গভীর গর্ত। তাকালে মাথা ঘোরে। ওরা তো ভেবেই পায় না, আবাব এখানে এখানে পথ তৈরি হবে কিভাবে!

শুনতে পায় নতুন পরিকল্পনা। ওদিকে আব পথ বানানো হবে না। লুপটাকে বাতিল করে দেয়া হবে। বেলের বড় ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন, এখানে তৈরি হবে রিভার্স। এই বেলের সবচেয়ে বড় রিভার্স হবে এটা। এই পাহাড় কেটে তিনটে ধাপ তৈরি হবে। ট্রেন প্রথমে সোজা গিয়ে আধমাইল পর্যন্ত পেছু হেঁটে উঁচুতে উঠে আবার সোজা যাবে। এ তো আর যে সে কাজ নয়, পাকা দুবছর সময় লাগবে। এতবড় পাহাড় কাটতে হবে। দিনরাত কাজ চলবে। ট্রেন ট্র্যানশিপমেণ্ট চলবে। যাত্রীদের অসুবিধে হবে

ঠিকই। তবু যদি ট্রেন লাইন রাখতেই হয়, এছাড়া উপায় কি। হাজার ছয়েক লোকও চাই কাজের জন্যে। জোয়ান-মরদ পুরুষরা শাবল-কোদাল চালিয়ে মাটি কাটবে, আর মেয়েরা ডোকো বোঝাই করে ঐ মাটি ফেলবে খাদে। ছেলের দল পাথর কাটবে ইটের মাপে—দেয়াল গাঁথার জন্যে জড় করবে পাথর। বুড়িরাও ঠুকঠুক করে পাথর কাটবে। কাজ আরম্ভ হয়। বেশ আনন্দে কাজ করে ওরা। কী একটা উত্তেজনা আছে যেন। গল্প-কথা-হাসিতে মেতে থাকে সবাই। বয়সের কোন ব্যবধান নেই। ইয়ারকি ফাজলামি, ফষ্টি-নষ্টি সমানে চলে। এর ওর তার হাড়ির খবর, ঘরের খবর, মনের খবর নিয়ে রসিকতা হয়। কার বিয়ের আগে কটা বাচ্চা হলো, কে কার সঙ্গে পালালো এসবই এখানে উপাদেয় আলোচনা। লজ্জা, সরম, শালীনতার বালাই নেই। কে নিজের যৌবন দেখিয়ে তাক লাগাতে পারে—কাজ আদায় করতে পারে সেই চেষ্টা চলে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা, ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। কানি মাইলির বয়েস হলেও রস শুকোয় নি। একটা চোখেই হাসে। পাথরে হাতুড়ির বাড়ি মেরে কথার টুকরো ছোড়ে। ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ভয়ডরও নেই ওর। বৈদারের ভাবি জুতোর আওয়াজ পেলেই ওরা কাজে মন দেয় কিন্তু কানি মাইলির খেয়াল নেই। সে হেসে রসিয়ে কথা বলেই চলে।

—হাত চালাও, হাত চালাও। হুঙ্কার দেয় বৈদার। হঠাৎ দেখে অবাক হয় ওরা। কানি মাইলি একটুকরো পাথর ছোঁড়ে বৈদারকে। বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে চলে যায় বৈদার।

আশ্চর্য! একটুও রাগে না-তো। সাহস আছে কানির। ওরা মাটি ফেলে কাছে আসতেই বলে কানি—ভারি গুমোর বেটার। স্বাস্থ্যটা ভালো কিনা। এখন ফিরেও তাকায় না আমার দিকে। বুড়ি হয়ে গেছি কিনা। একদিন আমারি পাশে

ঘুরঘুর করতো। তখন আমার ছুটো ছিল। অসুখ হয়ে একটা নষ্ট হয়েছে পরে। সেবার বড় পাগলায় পইরো হলো। ও সেখানেও বৈদারি করেছে। যা মজা লুটেছি ছুজনে। খিলখিল করে হেসে ওঠে কানি। ওরা নড়ে না। গল্পের রসে জমতে চায়।

—আমায় শাড়ি দিত, চোলি-মুজেত্র দিত। কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো। তখন আমারো স্বাঁস্থ্য ভালো। তোদের আর কি, তখন আমার যা স্বাস্থ্য—অভদ্র ইঙ্গিত করে। ওরা মুখ টিপে হেসে এ ওর গায়ে চিমটি কাটে।

—শেষে হল কি জানিস। বুঝতেই পারিনি আমি, পেট বড় হয়ে গেল। আমার লোকনে তখন ইম্‌ফলে, ছমাস আসেনি। কী লজ্জা বলতো। বৈদার তো রেগে আগুন, বলে ও জানে না। কি বদমাস বলতো! ভয় হোল লোকনে এসে না পড়ে এর মধ্যে। তাহলে-তো কেটে কুচিকুচি করবে। চেনাজানা সবাই হাসাহাসি করে। তিনমাস কাজ করেছি—তারপর ঘরে বসে রইলাম। তখন আবার ঘরে আসতে লাগলো বৈদার। বলে আমায় নিয়ে যাবে ওর ঘরে। ভাবলাম, হয়তো সত্যি কথা বলছে। একটা ছেলে হোল আমার। পাড়ার লোকে যা-তা বলে। তখন উঠে চলে গেলাম খইয়াবাড়ি। ছোট একটা ঘর আর বারি ছিল। মকাই রাইশাক হোত। ওই সব বেচে চালাই। ওদিকে ছুবছর বাদে লোকনে এসে হাজির। প্রথমদিন খুব আদরটাদর করলো, তারপর কোথা থেকে সব শুনে এসে মদ খেয়ে খুব পেটালো আমায়। ছেলেশুদ্ধ আমায় তাড়িয়ে দিয়ে ঘরে তালাবদ্ধ করে দিলো। তারপর ঐ ঘরে আর এক বৌ এনে রেখে চলে গেলো ইম্ফলে। কী কষ্ট যে গেছে আমার, তোদের বলবো কি! বৈদারকে বললাম, ও তখন ক্ষেপে আগুন। বলে আমি খারাপ মেয়ে, ঘরে নেবে না। শেষে ছেলেটাকে ইষ্টিশনে রেখে সরে পড়লাম। যা ইচ্ছে হোক। ভিক্ষে করে

চেয়ে চিন্তে খেয়ে ঠিক বেঁচে থাকবে। অত সহজে মরবে না। অমন ছেলেমেয়ে তো কতো ঘোরে পথে। তা আমার কপাল ভালো জানিস! ঐ ছেলে ক্লিনার হোল, তারপর ড্রাইভার। এখন ট্রাক চালায়। আমাকে ও চেনে না কিন্তু আমি ঠিক চিনি। যা ভালো লাগে মনটা ওকে দেখলে। একদিন খবর পেলাম, আমার বিয়ে-করা লোকনে অসুখ হয়ে মারা গেছে ইস্ফলে। আমি রাড়ি হোলাম। তারপর তিনজনের সঙ্গে ঘর করেছি। ছিঃ ছিঃ পুরুষগুলো বড় হারামির জাত। এখন তাই একাই থাকি। এই ভালো। মাঝে মাঝে এ ও সে ঘরে আসে। টাকাটা দেয়, কাপড়-চোপড় দেয়। দুচোখ বুজিয়ে হাসে কানি—বয়েস হলেও এখনো এই শরীরের দাম আছে রে।

গল্পে জমে ওঠে ওরা। ওদিকে মাটির পাহাড় জমে। কানে আসে বৈদারের ভারি জুতোর শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় ডোকা নিয়ে মাটি বোঝাই করতে। দেখলে আর রক্ষে নেই গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।

বিকেল হলেই যে যার মত ডোকো ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়। ঝরণার জলে হাত-পা মুখ ধোয়। এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। হাটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে কাদা সাফ করে। টুকরো টুকরো কথা ছোড়ে। হাসে, এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ইঞ্জিন বাঁশি বাজায়। ছোটে ওরা দলবেঁধে। ঝুপঝাপ লাফিয়ে ওঠে। গাড়ি ছাড়ে। সমস্বরে গান ধরে—হিমালয় চুল্লি, তিয়ো পল্লো পাটি। কটুয়া, বিড়ি, সিগারেট ধরায় যে-যার মত। ছোট ছোট ছেলেরা খইনি নেয়।

রাতের শিফ্‌টের কুলি আসে। এ দলে প্রায় সবাই জোয়ান-মরদ। মেয়ে দুচারটে মাত্র। তাও নিজের নিজের বরের সঙ্গে যারা আসে তারা। কুমারী মেয়ে নেই বললেই হয়। ওদিকটায় পিপুলগাছের পাশে তাঁবু পড়েছে। দশবারোটি তাঁবু। বাবু সাহেবেরা যাবে, সর্দার যাবে। একদিকে বিজলীবাতির সরঞ্জাম।

বড় বড় পাথর ভাঙ্গার যন্ত্র এসেছে কয়েকটা। ডিনামাইট রয়েছে প্রচুর। টিনের গুদামঘর তৈরি হয়েছে। সেখানে থাকে কোদাল-গাঁইতি, ঝুড়ি-শাবল। সাহেবদের মটরগাড়ি থেমে আছে। কাজ সুরু হবার পর ওরা চলে যাবে। তাঁবুতে বন্দুক, রাইফেল আছে। সর্দার, বৈদার সবার কাছেই বড় বড় খুকুরি।

পরদিন সকালে এসেই খবর শোনে ওরা। কাল রাত্রে চ্যাটার্জীসাহেবকে খুব পিটেছে এখানকার কুলিরা। মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এখন হাসপাতালে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ। শুনে ঘেন্না ধরে যায় ওদের। সকলেরই ঐ এক রোগ। রাত্রে নাকি মদ খেয়ে একটা মেয়েকে ধরে টানাটানি করছিল। তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছিল। তার বর তখন কাজ করছে। হঠাৎ চোখে পড়ে যায়। তখন ওরা দলবেঁধে ছুটে আসে। কে যে কিভাবে মেরেছে বলতে পারে না সঠিক। একে রাত্তিরবেলা, তার ওপর ওদিকটা বেশি অন্ধকার। এবার দুঃখ হয় শাইলির। বড় ভালো লোক চ্যাটার্জি সাহেব। সবাই ওর প্রশংসা করে। এত অল্পবয়সে এত বড় চাকরি জুটিয়েছে। তারই কিনা এই অবস্থা।

বড় সর্দার দেশবীর লামা মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিয়েছে সব ঝামেলা। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে বুঝিয়েছে, যদি শাস্তি দিতে হয় তাহলে রাতের শিফটের সব কুলিকেই দিতে হবে। তখন আবার নতুন গোলমাল। শেষে কাজ পিছিয়ে যাবে। কোন কুলি পাওয়া যাবে না। পাহাড়ি জাত, অশিক্ষিত, মূর্খ এরা, মিষ্টি কথায় কাজ আদায় করতে হবে এদের কাছ থেকে। চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই। বন্দুক, রাইফেলে ভয় পায় না। তার চেয়ে চ্যাটার্জিসাহেব সেরে উঠলে অন্য এরিয়ায় বদলির ব্যবস্থা করা ভালো। এখানে আর নয়। অবস্থা বিবেচনা করে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব দেশবীরের কথাই মেনে নিয়েছেন। তাই আর গোলমাল নেই কোন। যেমন চলছিল, তেমনি চলছে কাজ।

আড়চোখে দেখে নিল শাইলি, এখনো ঘুমুচ্ছে যশবীর। ঘুমোক। ওকে আর ডাকবো না। পাশ ফিরলো শাইলি। বাইরে সেই একঘেয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

পাহাড় কাটা হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। যেন হাট বসেছে। গোলমাল, হৈ চৈ এর শেষ নেই। বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে। কখনো দল বেঁধে ছুটছে ওরা। ধোঁয়া দিচ্ছে গাছের গোড়ায়। বড় বড় মৌচাক থেকে দলবেঁধে মৌমাছি উড়ছে। ওদের গুনগুন গুঞ্জনে চারিদিক ভরে গিয়েছে। বড় বড় গাছ পিঁপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আম্মা, আখা বলে চিৎকার করছে কেউ পিঁপড়ের কামড়ে। বাঁদরের দল আগেভাগেই পালিয়েছে।

বড় বড় গাছে লতিয়ে উঠেছে পাণ্ডড়া-লতা। ওরা পেড়ে আনছে। চমৎকার খেলা যায়। তেল চকচকে বাদামী, কালো পাণ্ডড়া হাতে নিয়ে পীচের রাস্তায় ঘুরোচ্ছে। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। ধোপাদের কাছে বিক্রি করা যাবে। গিলে করার কাজে লাগে। তাছাড়া ছেলেরা খেলে। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনে সচকিত হোল ওরা। পর পর দুবার। বড় একটা পাইথন চিলাউনে গাছটা জড়িয়ে ছিল। দেশবীর লামা গুলি ছুঁড়ে সাবাড় করেছে। ওরা ছুটলো অজিঙ্গর দেখতে। চামড়াটা ইঞ্জিনীয়ার সাহেব নেবেন। মাংস যারা খুশি নিতে পারে। দুজন কুলি গিয়ে খুকুরি দিয়ে পেট চিরতে আরম্ভ করলো। একরাশ ডিম বেরোলো পেট থেকে।

কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ ছিল। আবার যে যাঁর কাজে মন দিলো। ভাগ্যিস দেশবীর দেখতে পেয়েছিল সাপটাকে। নইলে কাকে জড়িয়ে গুঁড়ো করতো কে জানে! এই বড় বড় পাইথনরা ছোট হরিণ, খরগোস গিলে খায়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাসে টানে ওরা। এত ভারি শরীর, বিশেষ নড়তেচড়তে পারে না। ঝরণার ধারেই থাকে বেশি। একবার পেট ভরে খেয়ে প্রায় দুমাস চুপ

মেরে পড়ে থাকে। কত গল্প শুনেছে ওরা। চোখে দেখেনি বিশেষ। ছোট ছোট বাদামী হলুদ গুর্বাসাপই বেশি দেখেছে। তেমন বিষ নেই সে সব সাপের। কামড় দেয়, ঝাড়ফুঁক করে সারিয়ে তোলে।

বিকেল হতেই তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নেয় কালি গুনআর। ডোকোর গায়ে গোজা হাসিয়া টেনে বার করে—ঘরে বোঁদেল আছে, তার জন্যে মানে কাটতে হবে। আমি ঐ জঙ্গলে যাই। আর গুর্বা পেলে তুলে আনবো।

—গাড়ি ছেড়ে যাবে যে! তখন এতটা পথ যাবি কি করে। অবাক হয় শাইলি।

—তুই একটা বোকারহদ্দ। বাঁকাচোখে তাকিয়ে হাসে কালি গুনআর। তুই বুঝি ভাবিস, সবাই ওই ট্রেনে ফেরে। লক্ষ্য করে দেখিস, দুচারজন আগে থাকতে টুপটাপ করে সরে পড়ে। গোলাইয়ের আড়ালে ঝোপঝাড়ে সব লুকিয়ে থাকে। কত ট্রাক আসবে একটু পরে। তারাই নিয়ে যাবে। ঠোঁট টিপে হাসে আবার। যাই আমি তাড়াতাড়ি মানে কাটি।

শাইলি জানে, পোষা বুনোশুয়োরের নাম করে কচুশাক কাটলেও নিজেরাই খাবে। আর ওলশাকতো খাবেই। ঐ ওলডাঁটার মত দেখতে বলে সাপগুলোকে গুর্বাসাপ বলে। অবিকল একরকম দেখতে। চা-গাছের গোড়াতেই থাকে বেশি।

—গাড়িতে যেতে দেরিও হয় কত। আর আমরা ট্রাকে হুস করে চলে যাই। চলনা আমাদের সঙ্গে। কালি অনুরোধ করে ওকে।

—আমার তো চেনাজানা নেই, নেবে কেন? বলে শাইলি।

—চেনাজানা যেন আমাদের সঙ্গেই ছিল! করে নিতে হয়। আর তুই থাকলে তো আমাদের নেবেই না। যা চেহারা তোর! চোখ টেপে ওর দিকে চেয়ে।

লজ্জা পায় শাইলি।—কি যে বলো তুমি! ট্রাকে চাপার ইচ্ছেটা দুর্বার হয়ে ওঠে। যাওয়াই যাক না ট্রাকে। ভারি মজা হবে।—তাহলে আমি হাত-পা ধুয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো ঐ গোলাইতে, তুমি যাবার সময় ডেকো। আমতা আমতা করে বলে শাইলি।

—উঁহু তাহলে কাল ওরা তোকে রক্ষে রাখবে না। ক্ষেপিয়ে পাগল করে দেবে। তারচেয়ে চলনা আমার সঙ্গে। দুজনে মানে-পাত কাটি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। চলতে চলতে বলে কালি।

দুজনে একরাশ মানে-গুর্বা কেটে জড় করে। লতা দিয়ে বেঁধে খাদ থেকে উঠিয়ে রাস্তার পাশে রাখে। ট্রেনের শব্দ কানে আসে। ঝকঝক করে এগিয়ে আসে ট্রেন।

—আয় আমরা এই ভিরে নেমে লুকোই।

দুজনে নেমে পড়ে পথের পাশের খাদে। মাটি কাঁপিয়ে চলে যায় ট্রেন। এবার বুক কেঁপে ওঠে শাইলির। যদি না আসে ট্রাক! যদি তাকে না নিতে চায়? এই অন্ধকারে, এই দু নম্বর লুপে যদি থাকতে হয় সারারাত? মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায় ওর। মাকড়সার জাল চোখেমুখে জড়িয়ে গেছে। দুচারটে পোকা কামড় দিয়েছে। গা চুলকোচ্ছে গাছের পাতা লেগে। দুজনে উঠে আসে!

—এগুলো এখানে থাকুক। চল আমরা দেখি ট্রাক এলো কিনা! কালি ওর হাত ধরলো।

দূর থেকেই হাসির শব্দ কানে এলো।—ঐ ছাখ, তুই তো ভাবিস সবাই ট্রেনে যায়। ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছে, গল্প করছে।

অবাক হয় শাইলি। সত্যিই তো! চন্দ্রা, ময়নামতী, রুপাবতী ফুলকুমারি, ভোটি সবাই রয়েছে। প্যাঁক, প্যাঁক হর্ণের শব্দ পাওয়া গেল। একটা ট্রাক এসে থামলো। লয়না, রূপা, ভোটি, সব লাফিয়ে উঠে পড়লো পেছনে।

—আর ওরা উঠবে না? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে শাইলি।

—উঠবে বৈকি! চন্দ্রা সামনের সিটে বসবে। ওর আলাদা জায়গা। এটা তিনশো উনিশ, ভীমে মঙ্গরের গাড়ি। খুব দোস্তি চন্দ্রার সঙ্গে। মনে হয় ঘর বাঁধবে কিছুদিনের মধ্যে।

—আমরা যাব না? জানতে চায় শাইলি।

—ভয় করছে বুঝি? হ্যাঁ, এবার আসবে। আমরা যাবো যশের গাড়িতে। সাতশ একুশ। এখনি ফিরবে শিলিগুড়ি থেকে। ওর পাশে বসবে ফুলকুমারী। আমরা পেছনে বসবো। কথাব মাঝেই কানে এলো হর্ণের শব্দ।—এই যে এসে গেছে। চল, চল, জোবে পা চালা।

ওর দিকে চেয়ে মুখটিপে হাসলো ফুলকুমারী, চোখ বেঁকিয়ে। ষ্টিয়াবিঙে হাত রেখে মুখ বাড়ালো যশে—অলিক ঢিলো ভয়ো আজু। বাটো মা চক্কা বিগড়েকো থিয়ো। দেরির কৈফিয়ৎ দিলো ফুলকুমারীকে। সে মুখ গোঁজ করে কোন কথা না বলে ওর পাশে বসলো।

এবার কালিকে বললো যশে—আজু নয়া মানছে হেরদেইছুঁ। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শাইলি।

– অঁ, বললো কালি, হাতখুট্টা ধুনু জান্দা গাড়ি ছোড়ে ও। উয়া গোলাইমা গাড়ি একদিন বোকনু পড়ছ, মানে টিপি রাখেকো ছু, বোঁদেলকো লাগি।

--ল। ছিট্রো চড। ঢিলো ভয়ো। তাডা দিলো যশে। লক্ষ্য করলো শাইলি, বাববাব আড়চোখে তাকে দেখছে যশে। ফুল-কুমারী একটা পান চিবিয়ে পিক ফেললো পথে। ওরা উঠে পড়তেই ট্রাক ছাড়লে। এঁকে বেঁকে পাহাড়ি পথে ছুটে চলেছে ট্রাক। শক্ত করে কাঠের রেলিঙ ধরে আছে শাইলি। কানে আসছে যশে-ফুলকুমারীর হাসি, কথার টুকরো।

তিনধারিয়ার জিগজাগে দেখা হোল ট্রেনের সঙ্গে। হুস করে

পেরিয়ে গেলো ওরা। হাত নাড়ছে সবাই, চিৎকার করছে। মনে মনে খুশি হোল শাইলি। অনেক আগে পৌঁছতে পারবে আজ। সময় পাবে হাতে। রান্না খাওয়া আছে। রোজই যদি এমনিভাবে আসা যেত!

ঘুমতিতে গাড়ি থামলো। ফুলকুমারী নামলো। আবার গাড়ি ছাড়লো। কিছুটা এগিয়ে থামলো হঠাৎ। মুখ বার করে হাসলো যশে—ইয়া আঁউনা, পিছাড়ি বসন্নু অফঠারো হুনছ।

লজ্জায় লাল হোল শাইলি। মুখে কথা ফুটলো না। কাঠ হয়ে বসে রইলো। এখানে অসুবিধে কোথায়, বেশ তো আছে, আবার সামনে কেন?

কালি ফিসফিস করে বললো—যা না ছিটো, তব সদাই গাড়িমা লিয়াউঁছ।

অগত্যা কথা না বাড়িয়ে নেমে পড়ে শাইলি। ঘুরে গিয়ে বসে যশের পাশে। গাড়ি ছেড়ে দেয়। ষ্টিয়ারিঙে হাত রেখে বকে চলে যশে। খুটিয়ে খুটিয়ে জেনে নেয় ওর ঘরের কথা, বরের কথা। কথাবার্তায় এমন যে মনেই হয় না ও ওর অচেনা। যেন কতকালের পরিচয় দুজনের মধ্যে। দিলখোলা লোক, হোঃ হোঃ করে হাসে। যা মনে আসে তাই বলে। শাইলিও সহজভাবে কথা বলতে আরম্ভ করে। একটি পান এগিয়ে দেয় ওর দিকে। হাত বাড়িয়ে নেয় শাইলি। মাঝে বেশ ফাঁক ছিল এতক্ষণ। চোখের ইসারায় সরে বসতে বলে যশে। জড়সড় হয়ে একটু সরে বসে শাইলি। হালকা রকশির গন্ধ আসছে নাকে। বেশ লাগছে যশেকে। চমৎকার লোক!

গাড়ি থামায় যশে। ওরা নামে সবাই। কালির দিকে তাকিয়ে বলে যশে—ভাইজু ভোলি পুনি মেরো গাড়িমা আঁউনু।

—ল। হাসে কালি। এখনি আগামীকালের আসবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সে-তো রোজই আসে। একথাটা শাইলির জন্যে বলা

হোল তা সে বুঝতে পারে। লজ্জা পায় শাইলি। পেছনে এসে ডোকো নামায়। কচুপাতার বোঝা নামাতে সাহায্য করে কালিকে। বেশ তাড়াতাড়ি এসেছে ওরা। ট্রেন আসতে এখনো একঘণ্টা বাকি।

আর লোকলজ্জার ভয় নেই ওর। সকলেই জেনে গেছে ও যশের গাড়িতে ফেরে আজকাল। যশের পাশে বসে। ফুলকুমারীর সে কি রাগ! রাগে ফুঁসছে। সেদিন ও যখন হাত-পা ধুতে গিয়েছে তখন যশে হঠাৎ গাড়ি ছেড়ে দিল। কালি বললো— ফুলকুমারী পড়ে রইল যে!

—থাকুক। হাসলো যশে। অনেক গাড়ি পাবে পরে। আমার হাতে সময় নেই।

বুঝলো কালি, আসলে ওর মনবদল হয়েছে। শাইলির ওপর মন পড়েছে। ভারি বেয়াড়া এই ড্রাইভারগুলো। পরের ঘর ভাঙতে ওস্তাদ। কেন, ফুলকুমারীকে তো দেখতে খারাপ নয়। তাছাড়া এখনো বিয়ে হয়নি ওর। জাতেও মিল আছে যশের সঙ্গে। খুব ভাবও জমেছিল দুজনের মধ্যে। তবে কেন পরের ঘর ভাঙার মতলব! শাইলিতো পরের বিয়ে করা বৌ।

তবু কোন কথা বলে না কালি। জানে সে, কোন কথায় কাজ হবে না।

সব দোষ যেন শাইলির। মুখ বুজে শুনলো ওর গালাগালি কিছুক্ষণ। যা-মুখে আসে তাই বলে গেলো ফুলকুমারি। ডাইনি, বকশিবুড়ি, শয়তান, আরো নানাকথা। শাইলির কথায় নাকি সেদিন ওকে ফেলে রেখে গাড়ি চালিয়েছে যশে। শেষে নয়শ ত্রিশের বাবুলাল ওকে নিয়ে এলো। অসহ্য ঠেকছিলো শাইলির, তবু চুপ করে সহ্য করে গেলো।

কালিই এগিয়ে এলো—ওকে বলছিস কেন? যদি সাহস থাকে, যশেকে বললেই পারিস। একটা পুরুষকে বাঁধতে পারিস না,

আর রূপের দেমাক করিস! চোখে কাজল দিস, মাথায় গুঁজিস ইন্দ্রকমল।

একেবারে আঁতে ঘা দিয়ে কথা। সাপের মত ফুঁসতে থাকে ফুলকুমারী। বিষ ঝেড়ে দিয়েছে কালি। ওর মুখের কাছে দাঁড়ানো যায় না। ভীষণ ধার জিভের ডগায়।

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে যশে।—ঠিক হয়েছে, ভারি রূপের দেমাক ছুঁড়ির। আর কোনদিন চড়াবো না আমাদের গাড়িতে। মনের সুখে শিস্ দিতে আরম্ভ করে যশে।

—তুমি তো আচ্ছা মেয়ে, একদিনও বাড়ি নিয়ে গেলে না! বলে ঠোঁট টিপে হাসে যশে।

চমকে ওঠে শাইলি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, চাপা গলায় বলে—

—চলো না, বলতে হবে কেন?

—ঠিক বলছো তো! ওর দিকে তাকায় যশে।

—হুঁ! মনে মনে হিসেব করে নেয় শাইলি।

ভাবেনি সে, সত্যিই আসবে যশে। পেছন পেছন আসে ও। তালা খোলে শাইলি। ভেতরে ঢুকে, ওদের বিছানায় গড়িয়ে পড়ে যশে—বেশ আছো তোমরা! আমার ঘরও নেই, ঘরের বাঁধনও নেই।

—বিয়ে করলেই পার। ডোকো নামিয়ে রেখে বলে শাইলি।

—একটা মেয়েও মনে ধরে না। তার চেয়ে দুচার পয়সা খরচ করে মাঝে মধ্যে ফুর্তি করে আসি। সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুঁজে বারকয়েক টান দেয়। ধোঁয়া ছেড়ে আড়চোখে তাকায় ওর দিকে —চা খাওয়াবে না, নাকি?

—চুলো ধরাই আগে। হাতমুখ ধুই। বেরিয়ে গেল শাইলি। বুক কাঁপছে তার। কতক্ষণ থাকবে ও, কে জানে! বলাও তো যায় না, আমার বর আসবে, আর বেশিক্ষণ থেকো না, আজ যাও। এসেই একেবারে বিছানায় জাঁকিয়ে বসেছে!

চায়ের গেলাস এনে ওর পাশে দাঁড়ালো শাইলি।

—লিনু হোস চিয়া।

কোন সাড়া নেই। বেশ চোখ বুঁজে নিশ্চিন্তে পড়ে রয়েছে তো!

—চিয়া ভয়ো। এবার একটু গলা চড়ালো শাইলি। তবু সাড়া নেই। বাঁহাত দিয়ে আস্তে ঠেলা দিল ওকে। ধড়মড় করে উঠে বসলো যশে। চোখ মুছে তাকালো—ইয়ে, মো ত নিদাঁয়ো। সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে চুমুক দিলো।

উঠে দাঁড়ালো যশে। বাঁচা গেল। মনে মনে ভাবলো শাইলি।

—আজ যাই। হাসলো যশে। মনে থাকবে, তোমার চা খাওয়ানো।

কোন কথা বললো না শাইলি। দরজা পর্যন্ত এলো পোঁছে দিতে। ও বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে ভেতরে এলো। বসলো উনুনের পাশে। একরাশ চিন্তার পোকা কিলবিল করছে মাথায়। কি যেন হয়ে গেল। কী যেন হচ্ছে। তার ভাগ্য নিয়ে খেলা সুরু হয়েছে একটা। যশে যেন ক্রমাগত তাকে টানছে। সাপের মত, ঐ বড়বড় পাইথনের মত পাঁকে পাঁকে তাকে জড়িয়ে ধরছে। আর বোধহয় এই জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না ও।

একটা ধাপ পাহাড় কাটা হয়ে গিয়েছে। চেহারাই বদলে গিয়েছে পাহাড়ের। যেখানে ছিল গাছপালা, পাথর, খাড়াই, সেখানে এখন গেরুয়া মাটি। হলুদ, লাল মাটি বেরিয়ে পড়েছে। দেয়াল গাঁথা হচ্ছে, অনেক অনেক নীচু খাদ থেকে। ওদিকে পাহাড় কাটা আরম্ভ হয়েছে। দিনেরাতে চলছে কাজ। বৃষ্টির জন্যে মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে কাজ। অনেকটা মাটি কাটা হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ ধস্ নেমে আবার সব তলিয়ে গেল। কাঁচা নতুন মাটি জলের ধারায় ধুয়ে গেল। নতুন করে দেয়াল গাঁথা আরম্ভ হয়। হাঁকডাকের অন্ত নেই। পাহাড় কাঁপিয়ে ডিনামাইট ফাটে।

চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে পাথর কুচি। ওরা নাগালের বাইরে দূরে সরে দাঁড়ায়। বড়বড় পাথর ফেটে চৌচির হয়ে যায়। পাথর কাটা মেশিন চলে। গোঁ গোঁ শব্দ হয়। একঘেয়ে। সন্ধ্যার আগেই ডায়নামো চলে। ফটর ফটর একটানা শব্দ, বুনো ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে মিশে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়। হরিণের পাল, হায়না, চিতা, হরিয়াল, নেকড়ে দূর থেকে দূরে সরে যায়। এই রাতেই মাঝে মাঝে দেশবীর নেমে যায় নীচে, রঙটঙ ছাড়িয়ে শুকনায়। বন্দুক কাঁধে নিয়ে দুচারজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। কখনো আনে সম্বর, থার, হরিণ, বুনো শূয়োর, কখনো রয়েলবেঙ্গল। চামড়া পেয়ে খুশি হন ইঞ্জিনীয়ার।

কাজ চলে। রোজগার ভালোই হয়। নিত্যনতুন ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়। ওপর থেকে তাগাদা আসে আরো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। ছমাস পেরিয়ে গেলো মাত্র একটা ধাপ করতে। তাও কাঁচা মাটি। সামনের বর্ষার আগেই শেষ করতে হবে কাজ। বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে যাবে কিছু, শক্তও হবে। যেখানে যা ভাঙবে, জোড়াতালি দিতে হবে। ট্র্যানশিপমেন্ট বন্ধ করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। থ্রু ট্রেন না চললে চেঞ্জার আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এত কষ্ট সহ্য করে লোক আসতে চায় না। চেঞ্জার না এলে পাহাড়ের লোকের অভাব-অনটন মিটবে না। হোটেল, হাট বাজার চলবে না। বছরে দুবার চেঞ্জারের দল আসে বলেই তো রক্ষে।

প্রায় রোজই আসতে আরম্ভ করেছে যশে। চা খেয়ে গল্পগুজব করে ফিরে যায়। বেশ লাগে শাইলির। একা একা মন টিকতো না। একজন তবু কথা বলার লোক মিললো। দুঃখ হয় যশের জন্যে। এমন স্বাস্থ্য, এত চমৎকার কথাবার্তা, এত রোজগার, তবু ঘরনী নেই। ঠিকমত খাওয়া-শোওয়া হয় না। এখানে ওখানে পড়ে থাকে।

দরজা পর্যন্ত এলো অন্যদিনের মত। বাইরে বেরোবার আগে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে ওকে আকর্ষণ করে বুকে চেপে ধরলো যশে। আচমকা আকর্ষণে বিহ্বল শাইলি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। ওকে বুকে চেপে ধরে আবেগজড়ানো গলায় বললো যশে—চল, আমার ঘরে চল শাইলি। তোকে কত খুশিতে রাখবো, কত আনন্দে থাকবি। তোকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি মরে যাব। আমায় ফিরিয়ে দিসনা।

কোন কথা বললো না শাইলি। অবাক হয়ে গেছে সে। হতচকিত। আজ কি বেশি মাত্রায় রকশি পড়েছে পেটে? তার মনের দুর্বলমুহূর্তে তাকে বুকে টেনে নিল যশে। বাধা দিতে পারলো না। এখনো রাগ করতে পারছে না। অনেক চেষ্টায় নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটে এলো ঘরের মধ্যে। থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। আগুন ছড়াচ্ছে চোখ-কান-মাথা দিয়ে। কাল থেকে ওর গাড়িতে আসবো না, কথা বলবো না ওর সঙ্গে। আমার ঘর ভাঙতে চায়। বারবার প্রতিজ্ঞা করলো মনে মনে। তবু যেন তেমন রাগ হচ্ছে না ওর ওপর। ও কখন চলে গেল তাও খেয়াল নেই শাইলির।

মনকে অনেক শাসন করেও কাজ হোল না। চোখাচোখি হতেই হাসলো শাইলি। অন্যদিনের মতই। সেই মুহূর্তে মনেই পড়লো না গত সন্ধ্যার প্রতিজ্ঞার কথা। পাশে এসে বসলো, কথা কইলো। যেন কিছুই হয়নি। পেছন পেছন এলো যশে। চা খেলো, হাসলো, গল্প করলো। যাবার সময় ওর গালে টোকা মারলো আস্তে করে।

—আঃ দুখছ। চোখ পাকালো শাইলি।

হাত বাড়ালো যশবীর। একছুটে ঘরের ভেতরে শাইলি।

কথা নেই, বার্তা নেই, ঘরে ঢুকেই গালাগাল আরম্ভ করলো

শুকুলাল। ষাঁড়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। এবার ওকে মারতে আরম্ভ করলো নির্দয়ভাবে। প্রথমে হকচকিয়ে গেলো শাইলি। তারপর বাধা দিতে চেষ্টা করলো। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে আরম্ভ করলো কিল চড় লাথি। চিৎকার করে কাঁদলো শাইলি। ওর হাতে কামড় বসালো। কোন ফল হোল না। প্রায় বেহুঁস করে ফেললো মারতে মারতে। অকথ্য ভাষায় গালাগাল -বৃষ্টি সুরু হোল। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘর ভরে বমি করলো।

সারারাত উঠতে পারলো না শাইলি। সকালে ঘুম ভাঙতে সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা অনুভব করলো। একটু জ্বরজ্বর ভাব। শুকুলাল ঘুমুচ্ছে বেঘোরে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লো শাইলি। একদিন কামাই হলে, পয়সা তো কাটবেই, ছাড়িয়েও দিতে পাবে। পথে চলতে চলতে মনস্থির করে ফেলে সে। না, আর নয়। অনেক সহ্য করেছে, আর নয়। কারণে অকারণে যখন-তখন এমন মারবে। বিয়ে-করা-বৌ বলে মাথা কিনে নিয়েছে? কেন আমি সহ্য করবো ওর অত্যাচার? আমিও ভালোভাবে বাঁচতে পারি। নিজে রোজগার করি, তবে কেন পড়ে পড়ে মাব খাব? এখনো বয়েস আছে, রূপযৌবন-স্বাস্থ্য আছে। তাছাড়া—তাছাড়া যশে তো আমার পথ চেয়েই আছে! আমি একবার হ্যাঁ বললেই হোল।

কাজে মন লাগছে না আজ। একে শরীর ভালো নেই, গায়ে এখনো ব্যথা, তার ওপর চিন্তার একবাশ পোকা কিলবিল কবছে মাথায়। কি বলবে? কেমন করে বলবে? যদি যশে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে! যদি বলে, ও একটা মূহূর্তের খেয়াল, ঠাট্টা করেছিলো! যদি শুকুলালের মত ব্যবহার করে দুদিন পর থেকে? যদি কেটে যায় চোখের নেশা, মুছে যায় মনের রঙ।

তবু যা-থাকে-কপালে ভেবে বলেই ফেললো শাইলি। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলো যশে। সে আশা করেনি এত তাড়াতাড়ি রাজি হবে শাইলি। কি যে করবে ভেবে পায় না।

—হ্যাঁ, আজই, এখুনি। আর তোকে সেখানে ফিরে যেতে হবে না। সোজা আমার ঘরে গিয়ে উঠবো। থাক তোর জামাকাপড়। সব আমি কিনে দেব। আমরা নতুন করে ঘর বাঁধবো। খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে যশে।

মনে মনে খুশি হয় শাইলি। তাহলে সত্যি, লোক খারাপ নয় যশে। গাড়ি থামিয়ে একবোতল রকশি কিনে আনে যশে।

—সারারাত আজ ফুর্তি করবো। তোকেও রকশি খেতে হবে। রোটি-মাশু কিনে আনবো দোকান থেকে। কাল থেকে একসঙ্গে বেরোবো। যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে যাব তোকে। অত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে না। কোন কথা বলে না শাইলি। খুশিই হয় মনে মনে।

সেই তখন থেকে। সে সব দিন কি ভোলা যায়! এই বর্ষাকালেই একঘব ছেড়ে আর একঘর বেঁধেছিল সে। তখনো ছিলো এই চন্দ্রবীর বৈদার। নাঃ অনেক বেলা হোল! ঝিরঝিব বৃষ্টিব বিরাম নেই। আজ আর থামবে না। সেই কাল পর্যন্ত চলবে। আচ্ছা লোকতো যশবীর। এতক্ষণও ঘুমুতে পারে? এবার ডেকে দিতে হয়। বিকেল হয়ে গেছে। সন্ধ্যে হল বলে! শান্তবীর ফিরে আসবে। খুব চটবে যশবীর, ছুটির দুপুরটা এমনি ভাবে মাটি হবার জন্যে। ওকে ডেকে দিইনি বলে বকবে, রাগ করবে। বিছানায় উঠে বসলো শাইলি। না ডেকে ভালোই করেছি। যা বিরক্ত করতো! মদ বেশি টানলে ভারি হিংস্র হয়ে ওঠে যশবীর। কথা শুনতে চায় না। তাছাড়া যা জোর ওর গায়ে। তবে একদিক দিয়ে ভালো, মারধোর করে না। খুব ভালোবাসে আমায়। উঠে উনুন ধরায় শাইলি।

চায়ের জল গরম হলে ডাকে যশবীরকে—আম্মই, কতি নিঁদাকো! চার পাঁচ ঘণ্টা ভয়ো।

দুহাতে চোখ কচলে তাকায় যশবীর। এতক্ষণ অন্য রাজ্যে ছিল সে। আস্তে আস্তে উঠে বসে। সত্যি, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে তো। বেলা পরখ করে। বাইরে অন্ধকার হচ্ছে ক্রমশঃ। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। হেসে তাকায় ওর দিকে—কিনো বোলাইস না মোলায় ?

বাঁচা গেল! বাগেনি তাহলে। মিটিমিটি হাসে শাইলি—তেসোই। এমনি।

এবার চা খেয়ে বেরোবে যশবীর। দুচারটে গ্যারেজে ঘুরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে ফিরে আসবে। এর মধ্যে ফেরবে শান্তবীর। পয়সা বুঝিয়ে দেবে শাইলিকে। কাঁচা বাদাম কিনে আনবে। তারপর ওর রান্না শেষ হলে সেই বাদাম ভাজা হবে। দুজনে মিলে বাদাম ঠোঙায় পুরে মুখে আঠা দিয়ে বন্ধ করবে। প্রায় যখন কাজ শেষ হয়ে আসবে তখন ফিরবে যশবীর। এসেই একমুঠ বাদাম হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে খাবার জন্যে।—সারো ভোক্ লাগেও ছিট্টো খানু দে।

উঠে পড়বে শাইলি খাবার দিতে। মাথা নীচু করে একমনে ঠোঙায় বাদাম পুরবে শান্তবীর।

যন্তরে আসে সকালবেলায়।—কেমন আছিস নানি ?

—ভালোই। তোমাকে যে এত শুকনো লাগছে বাজে! জানতে চায় শাইলি।

—আর বয়েস তো বাড়ছে। হাত-পা ফুলছে কদিন হোল। ভারি বইতে কষ্ট হয় আজকাল। তবু কি আর করি বল! বসে থাকলে তো না খেয়ে মরতে হবে। দিন আনি, দিন খাই। আমরা খেটেখাওয়া মানুষ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে যন্তরে।

চুপ করে থাকে শাইলি! কি কথা বলবে আর!

—বোসো বাজে, চা-বানাই। একটা কটুয়া এগিয়ে দেয়।

চোখ বুজে কটুয়া টানতে থাকে যন্তরে।

অবাক হয় শাইলি। অন্যদিন তো এত মনমরা, চুপচাপ থাকে না বাজে। কি হোল আজ।

এতক্ষণে আসল কথাটা পাড়ে যন্তরে—শুনেছিস নানি, দমিনিটা মরে গেছে।

—সে কি! আর্তনাদ করে ওঠে শাইলি। কৈ! সে তো বোলেনি একথা।

কবে মারা গেল ? কি হয়েছিল তার? গলা বুজে এলো শাইলির।

—আমি জানতাম। গলা কেঁপে উঠলো যন্তরের। ঐ গোরাগুলো সব জানোয়ার! ওরা কি মানুষ থাকে নাকি। কাঁহা কাঁহা মুলুকে, মা, বোন, বৌ আত্মীয়স্বজন ছেড়ে ওরা চলে আসে যুদ্ধ করতে। শরীরে ওদের একতিল দয়ামায়া নেই। শুধু কি দমিনি! কত মেয়ে মরে যায়। দুচোখের জল মুছলো যন্তরে ময়লা কোটের হাতায়।—সমস্ত শরীর সাদা হয়ে ফুলে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখে বলেছিল রক্ত নেই। তবু কি ছাড়ান আছে! পয়সার ব্যাপার। খুব কান্নাকাটি করতো মেয়েটা। পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিল। শেষে পরশু রাত্রি মরে গেল। ওরা কাল লাশ মাটি দিয়েছে। বলেছি, অসুখে ভুগে মারা গেছে। লোভে পড়ে টাকা রোজগার করতে, ফুর্তি করতে গেলো এই তার ফল।

বোবা চোখে তাকিয়ে রইল শাইলি। কি কথা বলবে সে! ব্যথায় টনটন করে উঠলো মন। আহা বেচারী! কত কষ্ট পেয়ে, যন্ত্রণায় ছটফট করে মরেছে। বারবার দমিনির মুখ মনে পড়েছে। যত অন্যায়, অপরাধই করুক না কেন, দমিনির ওপর সে রাগ করতে পারেনি।

—আজ চলি নানি। চা খেয়ে উঠে পড়লো যন্তরে। একবার ডকদর খানায় যাব, যদি ওষুধ পাওয়া যায় কোন! হাটুর ওপরটা ব্যথা করছে।

দোলমা এলো কিছু পরে।—এই তুই নাকি পইরোতে কাজ

করবি না? বৈদার এসেছিলো, ফিরিয়ে দিয়েছিস। যা-তা বলে বেড়াচ্ছে তোদের নামে। বলে কিনা, দেখে নেবে। হেসে উঠলো দোলমা।

—হুঁ, দেখে নিলেই হল। বুড়োর তেজ আর নেই রে! নিজেকে খুব ইয়ে ভাবে। সবাই যেন ওর হুকুমের চাকর। সেই ডুনস্বর লুপে দেড় বছর কাজ করেছি। রিভার্স তৈরি শেষ হওয়া তক্। প্রথম দিনের গাড়িতে চড়ে রিভার্স পার হয়েছি তুতুবার। তারপর থেকে কত বড় বড় পইরো হল, আর যাইনি ডোকো নিয়ে। ও যেতে দেয়নি। তা তুই যাচ্ছিস নাকি?

—নারে, আমিও বলে দিয়েছি যাবো না। প্রথমে ভেবেছিলাম যাব। শেষে দেখলাম, তুইও যাবি না, দমিনিটাও মরে গেল, নৈশটীও চায়ের দোকান করছে, তাছাড়া—থেমে গেল দোলমা।

—তাছাড়া কিরে? অবাক হল শাইলি। দমিনির কথা শুনেছিস?

—সবাই জানে। দুঃখ করে লাভ নেই। আগেই জানতাম এমন হবে। মরে গিয়ে ওর ভালোই হল। বেঁচে থাকলে বছর বছর পেট ভারি হোত।

তা তুই গেলেই তো পারতিস পইরোতে। রোজগার হোত।

—না রে। মুচকি হাসলো দোলমা। ফিসফিস চাপা স্বরে বললো—আমি ব্যানার্জীবাবুকে রেঁধে খাওয়াই তো! ভাড়াকুড়ো মাজি, পঁচিশ টাকা করে পাই, দিনের বেলা খাই। বিকেলে চা-টা খাইয়ে চলে আসি। আবার সকালে যাই। দুচারটে কাজের কথা ছাড়া কোন কথা হোত না বাবুর সঙ্গে। কদিন ধরে লক্ষ্য করছি, বাবু প্রায়ই আমার দিকে তাকান। সেদিন বললেন, আমার রান্না নাকি খুব ভালো। যত্ন আদরও করতাম। চা-খাবার, চানের জল গরম, টাইমমত খাওয়ান—এ সব দেখতাম। সেদিন বললেন, আমাদের ভাষা শিখবেন। আরম্ভ করলাম। এমন

উচ্চারণ, আমি হেসে কুটিকুটি। বাবু বললেন কি জানিস—তুমি এত সুন্দর হাসতে পার তা মুখ গোমড়া করে কাজ কর কেন?

আমি বললাম—আমরা ঝি-চাকর, কাজ করে খেতে হয়।

—খুব জমিয়েছিস বল। শাইলি মুচকি হাসে।

—আঃ থাম দেখি, আমায় বলতে দে। ধমক দেয় দোলমা।

পরদিন সকালে জানিস, হঠাৎ আমার খোঁপা থেকে ইন্দ্রকমলটা তুলে নিয়ে বলেন, নিজে তো রোজ ফুল দিয়ে সাজো, আমার জন্যে তো আনলে না একদিনও। ফুলদানিটা ফাঁকা থাকে।

তারপর থেকে রোজ সকাল বেলায় ইন্দ্রকমল, ডালিয়া, বনগোলাপ নিয়ে যাই। আগে বাবু নিজের মনে বই পড়তেন, চিঠি লিখতেন, না হয় একটা মোটা খাতা খুলে কলম হাতে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এখন দেখি ওভাবে তেমন মন নেই। প্রায়ই আড়চোখে আমার দিকে তাকান। লজ্জা লাগে। ঘর ঝাড় দিতে গিয়ে বুকের কাপড় সরে যায়, মুজেত্র টেনে দিই। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাবু ব্যস্ত হন। এটা ওটা সেটা জিজ্ঞেস করেন। আমাদের সমাজের কথা, খাওয়া-দাওয়া, রীতি-নীতির কথা সব খুঁটিয়ে জেনে নেন। বলেন—তোমরাও তো হিন্দু, তবে কেন এত তফাৎ আমাদের সঙ্গে? তারপর নিজেই ভেবে জবাব দেন—আমরা লেখাপড়া শিখেছি, নানা ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছি, আমাদের নিজের জিনিস হারিয়ে গেছে। তোমরা সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ মেনে চলছো। ওর সব কথা বুঝিনা। শুধু হাসি। তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবু বলেন—তোমার হাসিটা খুব মিষ্টি। আমি ছুটে পালিয়ে যাই। যা লজ্জা করে।

সেদিন বাবু বললেন কি জানিস, আমার ছবি তুলবেন। আমি মাথা নাড়লাম।—আমায় তো দেখতে ভালো না, ছবি তুলে কি হবে?

তাকি শোনেন ! জোর করে ছবি তুলে ছাড়লেন। কত রকম করে যে তুললেন, কি বলবো তোকে। মাথায় মুজেত্র দিয়ে, দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে, শুইয়ে। বারোটা ছবি তুললেন আমার। ছবি তোলার সময় হাতে হাত ঠেকলো। শরীর কেঁপে উঠলো আমার।

বাবু বাড়ির গল্প করেন আমার সঙ্গে। দেশে মা আছেন শুধু। একটা ছোট বোন ছিল, তাও মারা গেছে। মা আসতে চান কিন্তু এই শীতের দেশে বাবু আনতে চান না।

আমায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন বাবু—কে কে আছে তোমার ? বললাম—কেউ নেই। একা থাকি।

—তোমার বিয়ে হয়নি ? অবাক হন বাবু।

কেঁপে উঠলাম। মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়লাম।

বাবু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন—আমারো বিয়ে হয়নি, যদি তোমায় বিয়ে করি ? রাজি আছো ?

কোন কথা বলতে পারলাম না আমি। কি বলবো বল ! দুহাতে শাইলিকে জড়িয়ে ধরলো দোলমা।

—তুই ডুবেছিস তাহলে ! হাসলো শাইলি।

—শোন না, ওর মুখে হাত চাপা দিল দোলমা। বাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবার আমি বললাম—তোমার মা যদি—

—সে ভয় নেই তোমার ! মা কিছু বলবে না। তুমি রাজি কিনা বলো।

তবু আমি জবাব দিতে পারিনি। ছুটে পালিয়ে এলাম। কি করি বলতো শাইলি ! একটা জবাব তো দিতে হবে। আমারো আর একা একা থাকতে ভালো লাগে না। তাছাড়া খুব ভালো লাগে ব্যানার্জীবাবুকে। মনে হয় লোক ভালো। ঠকাবে না।

—তুই মরেছিস ! মুখ ঝামটা দিল শাইলি। এত কাণ্ড হয়ে গেছে তা কৈ জানাসনিতো এতদিন। এখন শেষ সময়ে এসে বলিস, কি করবো ? আমি জানি না যা ! তোর যা খুশি কর।

—রাগ করিস কেন শাইলি। ওর মুখ তুলে ধরলো তুহাতে—আমি নিজেই কি বুঝতে পেরেছিলাম, কখন ভেতরে ভেতরে ইয়ে হয়ে গেছি! তুই ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই। বল না কি করি আমি? 'সবসময় আমার বাবুর মুখ মনে পড়ে—কোন কাজে মন লাগে না।

—কোনদিন রাত্তিরে থাকিসনিতো ওখানে? চোখ বড় করে তাকায় শাইলি।

—এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, বাবু সত্যি অমন নয়। শুধু সেই ছবি তোলার দিন প্রথম একটু যা গায়ে হাত লেগেছে! আর ঐ বিয়ে করার কথা যখন বললেন!

—হুঁ। কিছুক্ষণ ভাবলো শাইলি।—জানিস তো বাঙ্গালীবাবুরা ভারী ইয়ে। এমনি করে সব বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে হয়—তারপর হঠাৎ একদিন সব ফেলে রেখে চলে যায় দেশে। তাছাড়া অনেকের বৌ-ছেলেমেয়ে দেশে থাকে। আমরা তো জানতে পারি না। মিছে কথা বলে, ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে। ভেবে দেখিস ভালো করে।

—আমিও ভেবেছি এসব কথা। একটুক্ষণ থামে দোলমা।—তবে মনে হয়, এ বাবুটি তেমন নয় রে। কথাবার্তা, ব্যবহার, খুবই ভালো।

—তবে কর বিয়ে! তবে খবরদার, বিয়ে না করা পর্যন্ত যেন রাত্তিরে থাকিস না! সাবধান করে দেয় শাইলি।

—নারে না। তুই যেন একটা কি! আমায় একটুও বিশ্বাস করিস না। এখন চলি আমি। আবার আসবো।

চলে যায় দোলমা। শাইলি ভাবতে থাকে। ভালো হলেই ভালো। তবু একটা গতি হোল দোলমার। মেয়েটা ভালো। যদি বাবুটি ভাল হন, তাহলে ওদের জীবন সুখের হবে। মেয়েটা একটু সুখশান্তির মুখ দেখতে পাবে তাহলে। নিজের বলতে কেউ তো নেই ওর।

প্রচণ্ড বর্ষা নামলো। ধস্ নামলো এখানে ওখানে। পথ ভাঙলো, বন্ধ হল গাড়িচলা। আবার তৈরি হল, নতুন পথ। কাজে গেল না শাইলি।

ওদিকে পল্টন আসার বিরাম নেই। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে। অবিরাম চলছে যাতায়াত। এদিক থেকে লেখাপড়া-জানা মেয়েরা দলে দলে চলেছে যুদ্ধে। ওয়াকিতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে দলবেঁধে গান গায়—

আড়া বম্‌বম্, তিতো করেলা, পেগুালু খায়ে কোঁকাউছ।

যাউনা দিদি ডিপুমা, গোরালে ফিলা পড়কাঁউছ॥

ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও নেই ওদের! এরমধ্যে এমন গান বেঁধে ফেলেছে! মনে মনে লজ্জা পায় শাইলি। ডিপু মানে সেই জলাপাহাড়। ওখানে গেলে গোরারা উরু চাপড়াবে। ছিঃ, কি বাজে কথা!

জল ঢেলে ঢেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আকাশ। আর বুঝি জল নেই ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের চোখে। ঈশাণকোণের আকাশে নেই বাজপাখীর ডানার কালো ছায়া। হালকা শাদা মেঘ উড়ছে বনেপাহাড়ে। ঝরণার জলধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কানে আসে মৃদু কল্লোল। ভেড়ার লোমের মত শাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আকাশে। নীল আকাশ, সবুজ অরণ্য। পাহাড়ের গাছ-পাতার যত ধুলোবালি মালিন্য মুছে গিয়েছে। হাসছে প্রকৃতি। এতদিনে শেষ হল বর্ষাকাল। বর্ষা একই সঙ্গে এখানে অভিশাপ আর আশীর্বাদ।

সেই একঘেয়ে রিমঝিম ঝিরঝির শব্দ নেই আর। রঙিন পাখা মেলে, দলবেঁধে প্রজাপতি উড়ছে পাতায় পাতায়। গুণ গুণ গান গায় মৌমাছি। দোপাটি, ডালিয়া, জিনিয়া ক্রিশেন-থিমাস, কসমস, সূর্যমুখী, সবাই চোখ মেলে হাসছে একে একে। এখন শরৎকাল। একমাস কি দেড়মাস। এরই মধ্যে শরৎ-হেমন্ত

পাশাপাশি জড়িয়ে থাকে। কদিনেই সাঙ্গ হবে তাদের খেলা। আবার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবে, শীত আসবে বলে।

যশবীর বললো—এবার দশাই-তেওহারে মনের সুখে মজা লুটতে হবে। হাতে টাকা জমেছে বেশ।

—তাহলে আর কি! টাকা জমেছে যখন তখন উড়িয়ে দাও। বললো শাইলি।

—অমনি রাগ হল! সব কি ওড়াবো? সান্ত্বনা দেয় যশবীর। একটু ভালোমত খেতে পরতে, ভালোভাবে থাকতে, কার না সাধ হয় শাইলি! আমরা গরীব তাই পেরে উঠি না। এবার সুর পালটিয়ে চোখে কৌতুকহাসি ফুটিয়ে তোলে তাছাড়া আমাদের নতুন অতিথি আসবে তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে, সে আমার ঠিক খেয়াল আছে।

—যাও, তুমি ভীষণ ইয়ে। মুখে ফাগ ছড়িয়ে পড়ে শাইলির।

পরদিনই একটা ভ্যাংরুল আর একটা চ্যাংরা আনে যশবীর। বেশ তাগড়া, গা-ভরা লোম, বাঁকান শিঙ।—কিছুদিন পাললে আরো বলীয় হবে। · একটা দশাইয়ে কাটবো, একটা তেওহারে। খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম, ঘুমপাহাড়ে এক ভোটের কাছে।

কাজ বাড়লো শাইলির। ওদের খোরাক দিতে হবে রোজ ত্নবার। সকালে কচিসবুজ ঘাস কাটবে যশবীর। ত্নবেলা ও মাপমত খাওয়াবে ওদের।

—অনেকদিন আসতে পারিনি। সময়ই পাইনা। ভালো আছিস তো! ত্নপুর বেলায় এসে হাজির হল নেপটি।

—কেমন চলছে তোর দোকান? খুব তো নতুন গয়না পরেছিস। ভালো চোলি, মুজেত্র। খুব চা বিক্রি হচ্ছে বুঝি? হাসে শাইলি।

—শুধু কি চা? ওতে ক'পয়সা হয়? এবার মুজেত্রর আড়াল

থেকে একটা বোতল বার করে এগিয়ে দেয় নেপটি। এটা ড্রাইভারকে দিস।

হাতে নিয়ে বোতলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পাশে রাখে শাইলি।

—বাইরে অবশ্যি চা-রুটি-মাংস। তাতে কি লাভ হয় বল। তু'তুটো লোক রাখতে হয়েছে, তাদের মাইনে, সব দিতে হয়। আসল লাভ এতে। জলাপাহাড় থেকে খালি বোতল কিনে আনি তুআনা করে। তারপর ঘরে তৈরি ষাঁড়-রকশি পুরে ফেলি। ভাত পচিয়ে কোদো দিয়ে ষাঁড়-রকশি বানাই। এত চাহিদা, কুলিয়ে উঠতে পারি না। তাছাড়া এসব ব্যাপারে তো বাইরের লোক নেওয়া যায় না! এক বোতল তুটাকা পাঁচটাকাও বিক্রি করি মাঝেমাঝে। এমনিতে দাম পড়ে ছ থেকে আট আনা। এই এক বোতলের জন্যে গোরারা সবকিছু দিতে পারে। জামাকাপড়, ঘড়ি, পেন, ক্যামেরা, যা চাইবি দিয়ে দেবে। তবে অংরেজরা বড় কঞ্জুস, অমরিকান গোরারা খুব দিলদরিয়া। মুখ ফুটে বললেই হল, হাত পাতলেই, যা চাইবি।

—তোর ভয় করে না? ফিসফিস করে শাইলি। পুলিশে ধরতে পারে তো!

—ফুঁঃ সব জানা আছে! এককথায় উড়িয়ে দেয় নেপটি। প্রায়ই হানা দেয়! তুটো টাকায় ওদের মুখ বন্ধ। শেষে নিজে-রাই একবোতল গলায় ঢেলে টলতে টলতে চলে যায়। যারা বেশি টেঁটিয়া, তাদের কাছে চোখে জল এনে, একটু গলা জড়িয়ে চুমু খাই, না হয় মুজেত্র খুলে ফেলি। তাতেই কাজ হয়। হাসে নেপটি ফিকফিক করে। এবার হঠাৎ সুর পাল্টায়, তুইও আয় না শাইলি। তুজনে মিলে কাজ করলে আরো লাভ হবে অনেক বেশি। ডবল রোজগার। ঘরে বসে সময় নষ্ট করে কি লাভ? এবার পইরোতেও যাস নি। তার চেয়ে মোটা টাকা রোজগার

করবি ভালো শাড়ি পরবি, গা ভরা গয়না। ছাখনা আমার কি অবস্থা ছিল, এখন কি হয়েছে।

ছুহাতে কান চাপা দেয় শাইলি। প্রায় চিৎকার করে বলে—না, না লোভ ছাখাস না। আমার টাকার দরকার নেই আর। বেশ আছি। খাওয়ার-পরার কোন অভাব নেই আমার।

হাসে নেপটি—বুঝিনা, কি যে তোর মনে আছে। যাক, তোকে তো জোর করছি না আমি। তুই আমার বন্ধু তাই বললাম তোর ভালোর জন্যেই। আজ চলি আমি। হঠাৎ ছুচোখ ছোট করে ওর দিকে তাকালো নেপটি; হুঁ, খুব তো চেপে গেছিস আসল কথাটা। আচ্ছা তুইও তো যেতে পারিস আমার ওখানে। অচেনা জায়গা তো নয়। রুটি মাংস চা খেয়ে আসবি। ওর গাল টিপে ছায় জোরে।

—আঃ ছাড়ছাড়, আমি কি পুরুষমানুষ যে আদর করছিস ওভাবে?

—যা ফুলোফুলো লাল গাল তোর, দেখলেই চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। খিল খিল করে হাসে নেপটি। তাছাড়া আমার তো আদর করার মত পুরুষমানুষ নেই।

বেরিয়ে যায় ও। ওর গতিপথে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে শাইলি। বেশ আছে। কেমন হাসিখুশি ভাব। হাতে কাঁচা টাকা আসছে তাই মনের এই রঙ।

শরৎ আকাশে হালকা মেঘের মেলা। কালো মেঘ কেটে গেছে। একঘেয়ে বৃষ্টি নেই। আপন মনে কাজ করে শাইলি। হাটেবাজারে যায় আসে। আর এসে গেল দশাই। তারপরই তেওহার। বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব। সারা বছর ওরা এই দিনগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। টাকা জমিয়ে রেখে ফুর্তি করে, জামাকাপড় কেনে, গয়না গড়ায়। ছুএকদিন রোটিপিঙ চড়ে, মেলায় যায়, মদ খায়, জুয়া খেলে। চারিদিকে উৎসবের সাড়া-পড়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় শাইলি। মনে পড়ে তার সেই দিনের কথা। যেদিন প্রথম জানতে পারলো। ভাবতেই পারেনি সে।

ভাতের হাঁড়ি উপুড় দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে যায়। সামলে নেয় নিজেকে শাইলি। হড়হড় করে বমি করে ঘরের মধ্যেই। পেটের কোণে চিনচিন, অস্পষ্ট একটা ব্যথা। মনে হয় এখুনি বুঝি পড়ে যাবে। বমির শব্দে ছুটে আসে পাশের ঘর থেকে নেউরি। ওকে ধরে শুইয়ে ছায়। তারপর সাফ করে ওর বমি। ওর দিকে তাকায়—একটু বিশ্রাম কর, ও ঠিক হয়ে যাবে। অমন হয়। মিটিমিটি হাসে নেউরি ওর দিকে চেয়ে। সবুজ চোখ মেলে ওর দিকে তাকায় শাইলি।

—ভুড়িমা নানি আঁয়ো। ভুড়ি বোকদা তেসতো হুনছ। এবার বুঝিয়ে ছায় স্পষ্ট করে।

কেঁপে ওঠে শাইলি। আনন্দের শিহরণ বয়ে যায় দেহমনে। লজ্জায় লালিয়ে ওঠে। উঠে বসে বিছানায়। দরকার হলে ডাকিস। আমার উনুনে তরকারি হচ্ছে। পুড়ে যাবে শেষে। চলে যায় নেউরি।

বসে বসে ভাবতে থাকে শাইলি। কদিন থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। ভেবেছিল বুঝি এমনি ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে এই জন্যে? খুব খুশি হবে যশবীর। কত সাধ ওর, কত আশা। নিজেরও মন খারাপ লাগতো ওর। সকলেই বলাবলি করতো ও নাকি বাঁজা। ও নিজেও ভেবেছিল, হয়ত তাই বা। ভারি একা একা লাগে। যদি ছোট্ট একটা ছেলে বা মেয়ে থাকে-তো বেশ হয়।

রাত্রে যশবীরের কানে কানে বলতেই সে চিৎকার করে উঠলো আনন্দে। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললো—মেরো রামরো বধনি, তোলায় মো নাককো বুলাকি বনাই দিনছু, কণ্ঠা দিনছু,

তিলারি দিনছু, খুট্টাকো কল্লি, টাউকোমা শিরবন্দী বনাই দিনছু।
কথা ওর শেষ হতে চায় না। চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তোলে
শাইলিকে।

—আঃ ছাড়ো, মরে যাব যে। ওর আদর থেকে মুক্ত হতে
চেষ্টা করে শাইলি। মনে মনে খুশিই হয় সে।

চারিদিকে সাজসাজ রব। নতুন সাজপোষাক সকলেরই।
দশাই এসে গেল। চ্যাংরাটা বেশ বড় হয়েছে। পাহাড়ি ভেড়া,
সেই বরফের দেশ তিব্বতে থাকে এরা। এখন মোটাগোটা তাগড়া
হয়েছে খুব। যশবীর তুদিনের ছুটি নেয়। বিজয়া দশমীর দিন
সকালে চ্যাংরা কাটে। পাড়ার দশজনকে ভাগা দেয়। একবাটি
রক্ত রেখে দেয়। জমে গেলে বরফি মত কেটে ভেজে খাবে।
রক্তের বড়া ভাজা।

বড় খুকুরি দিয়ে এককোপে গলাটা কেটেই রক্ত ধরে রাখে
একটা পাত্রে। তারপর চ্যাংরার কণ্ঠনালীতে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে
সুতো বাঁধে। মাটিতে ফেলে গরম জল ঢালে গায়ে। এবার
হাতা দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় লোমগুলো। লোম শুকিয়ে রাখে।
মাথাটা দেয় পোড়াতে। বোঁটকা গন্ধে বাতাস ভরে যায়। বাজার
থেকে তুবোতল রকশি কিনে আনে যশবীর।

নিজে নতুন সার্ট-কোট-প্যাণ্ট পরে যশবীব। শাইলিকেও
নতুন জামাজুতো লাগাতে বলে। নাকে চুঙ্গরী পরতে বলে,
কানে ভালে সুন, গলায় তিলারী। ওর বাক্সে তোলা ছিল এসব।
তুপুরে একবার পেটপুরে মাংস খায় তুজনে। একবোতল রকশি
একাই খায় যশবীর। আর একটা বোতল রাত্রে খাবে। এবার
আর শাইলিকে জোর করে খাওয়াবে না। ওব শরীর ভালো নেই।

বিকেল হতেই বেরিয়ে পড়ে তুজনে। প্লাজাতে ভালো হিন্দী
সিনেমা চলছে। খুব নাচগান আছে। পা টলছে একটু একটু।
তবু হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে পথ চলে যশবীর। দেখা

হয় বন্ধু বান্ধব চেনা পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে। সবার মুখে হাসি। কপালজোড়া দই চালের ফোঁটা। কারো বা রঙিন। চাল-দইয়ের সঙ্গে ফাগ মিশিয়েছে। মা বাবা ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্যে কপালজুড়ে দই-চাল মিশিয়ে লাগিয়ে দেয়।

—আমাদের কে ফোঁটা দেবে। হাসে যশবীর। কপাল তাই ফাঁকা। তুমি তবু রঙবুক বস্তিতে গেলে পারতে। ছ্যামা ফোঁটা দিত।

কোন জবাব দেয় না শাইলি। সাধ করে সে আর সৎ-মার কাছে যাবে না, শুধু মাত্র ফোঁটা নেবার জন্যে।

সিনেমা দেখে খুশি মনে ফিরে আসে ওরা। এত হেসেছে আজ যশবীর যে ভয় করছিল শাইলির, হয়ত মাতলামি করবে ফেরার পথে। এতটা পথ নিয়ে যাবে কি ভাবে। কোন বাড়াবাড়ি করেনি এই রক্ষে!

বাড়ি ফিরে আবার মদ খায় যশবীব। একবাটি মাংস আর রক্তের বড়াভাঁজা। মনে মনে ভাবে শাইলি, কপাল ভালো তার, বাড়িতে রয়েছে যশবীর। সারারাত জুয়া খেলে ফাঁকা পকেটে ফেরেনি এই ঢের। এদের তো এই স্বভাব। এই ড্রাইভারগুলোর। সারারাত জুয়া খেলে, মদ গেলে, তারপর ফাঁকা পকেটে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে ঝাল ঝাড়ে বৌদের ওপর। এখন যায় নি যশবীর, তবে তেওহারে যাবে নিশ্চয়ই।

যন্তরের সঙ্গেই আসে দোলমা। ওকে দেখে অবাক হয় শাইলি। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য! চেনাই যায় না। বাঙ্গালী মেয়েদের মত শাড়ি পরেছে। মুজেত্র নেই, তার বদলে ব্লাউজের ওপর দিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়েছে কাঁধে। কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় সোনার হার, হাতে চুড়ি, লোহা, শাঁখা। চোখ ফেরেনা ওর। পায়ে চটি। আলতা মাখা পা।

—কিরে তোকে যে চেনাই যায় না! একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছিস! অবাক চোখে তাকিয়ে বলে শাইলি।

—বাঙলা কথাও শিখেছি। বলে দোলমা। হাসে। সত্যিরে খুব ভালো লোক। আমায় খুব ভালবাসে। লেখাপড়া না জানা, গরীব, মুক্ষু, পাহাড়ি মেয়ে আমি, ছদিন আগেও ওর কি ছিলাম তার ব্যবহারে বোঝাই যাবে না। সব শিখিয়ে দেয় আমায়। ছাখ কেমন চুল বাঁধি আজকাল। রোজ চান করতে হয়। বাক্স, শাড়ি-ব্লাউজ, শাঁখা, গয়না সব কিনে দিয়েছে। বেড়াতে নিয়ে যায়, সিনেমায় নিয়ে যায়। এবার শীতকালে আবার কলকাতায় নিয়ে যাবে। দেখিনি তো কোনদিন। কত গল্প শুনি। খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে দোলমা। এবার ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে গোপন কথা বলে।

—তাই নাকি! খিলখিল করে হাসে শাইলি। জানিস তোকে দেখে কিছুতেই মনে হচ্ছে না তুই সেই মুক্ষু দোলমা। মনে হচ্ছে আমি সিনেমা দেখছি।

—যাঃ তোর সব তাতে বাড়াবাড়ি। আমায় মানায়নি এবারে?

—খুব, খুব মানিয়েছে! এত ভালো লাগছে যে আমারই মনে হচ্ছে এই চোলি-মুজেত্র ছেড়ে শাড়ি ব্লাউজ পরি। একদিন আমায় পরতে দিস কিন্তু।

—আচ্ছা, তা দেওয়া যাবে। তোকেও চমৎকার দেখাবে। হাসে দোলমা।

যন্তরে চুপ করে বসে দেখছে এদের, শুনছে ছজনের কথা! সেও খুব খুশি। এদের ছজনের আনন্দের ভাগ নিয়ে হাসলো আপনমনে।

—বোসো বাজে, চা বানাই। শেলরোটি বানানো আছে দিচ্ছি। মাণ্ডও আছে, খাবে তো?

—দে, যা তোর খুশি। বললো যন্তরে। চৌকিতে বসে পা দোলাতে থাকে দোলমা।

মাংসের হাঁড় চিবুতে চিবুতে হঠাৎ বলে দোলমা—সেই অযুত্তির কথা মনে আছে তোর?

—কে ? মনে করতে চেষ্টা করে শাইলি।

—সেই-যে স্কুলে পড়তে যেত, সুন্দর মত মেয়েটা। যুদ্ধে চলে গেল—ওয়াকিতে। তার বাবার সে কি কান্না, যাবার দিন। মনে নেই ?

—তাই নাকি ! ছুটিতে না কাজ ছেড়েছে ? জানতে চায় শাইলি।

—শোন তবে। দেখলে অবাক হবি, মায়া হয়। কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তার। তুচোখের কোণে কালি, রোগা, একটুও হাসে না। মুখ ভার করে চুপচাপ বসে থাকে দিনরাত। অত হাসিখুশি মেয়ে। কোথায় সেই গায়ের রঙ, সেই চেহারার জৌলুস ! ওখানে গিয়ে নাকি নেশা কেটে গেছে। বুঝতে পেরেছে চাকরি একটা ভাঁওতা, একটা বুজরুকি। আসল ব্যাপার অন্য। সৈন্যদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। যা বলবে তাই করতে হবে। ওখান থেকে পালিয়ে আসবার কোন উপায় নেই। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া পথ নেই। শেষে ওর গায়ে খুব খারাপ রোগ হওয়ায় চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ও চলে এসেছে এখানে। কারো সঙ্গেই কথাবার্তা বলে না। অযুতিই বলেছে, অনেক মেয়ে নাকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। ওখানে ওদের লেখাপড়ার কিছু করতে হয়, রুগীর সেবাও। আবার সৈন্যদের মদ খাওয়া, নাচা, ফুর্তি করা, সবই করতে হয়। তুঃখ হয় অযুতির বাবা মার জন্যে। কত সাধ-আহ্লাদ ছিল ওদের ঐ মেয়ে নিয়ে।

এক নাগাড়ে সবটা বলে থামে দোলমা। কি জবাব দেবে শাইলি ! চুপ করে থাকে। সে জানে, ওই জলাপাহাড়ের ডাক যে শুনেছে, যে ঐ ডাকে সাড়া দিয়েছে, তার জীবনের সুখশান্তি সব শেষ।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে ওঠে ওরা। যাবার আগে বলে যন্তরে—দোলমা নাকি বেশ সুখে আছে। দেখলেও ভালো লাগে।

শাইলির চোখে চোখ রেখে হাসে দোলমা।

—আবার আসিস।

—হুঁ, যদি ছাড়ে। বাঁকা চোখে তাকায় দোলমা।

সন্ধ্যের পর নেউরি এলো। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিল শাইলি। ভাবলো এবার গল্প করা যাবে কিছুক্ষণ।

—চল শাইলি, একা ঘরে বসে কি করবি! পাশংদের বাড়ি ঝাঁকরি বসবে, দেখে আসি।

—কেন, ওদের আবার কি হোল?

—ওদের তিন ভাই পরপর মরলো শুখোকাস হয়ে। এবার পাশংকে ধরেছে ঐ রোগে, তাই ঝাঁকরি বসাচ্ছে।

আনমনা হয়ে পড়ে শাইলি। যশবীর ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করে তাই জানে ও। রক্ত শুকিয়ে যায় ক্রমশঃ, খুক খুক কাশি হয়, জ্বর হয় অল্প অল্প। খারাপ খাওয়া, আলোবাতাসহীন বাড়িতে থাকার জন্যে এই রোগ। একেই বলে টিবি। ভারি ছোঁয়াচে। তা ওরা মানবে না। একে একে ভোগে আর মরে যায়। ঐ নিয়েই খাটে, কাজ করে, একদিন মুখ দিয়ে বেশি রক্ত ওঠে; বমি করতে করতে মরে যায়। তবু ওষুধ খাবে না, ডাক্তার দেখাবে না। বলতে গেলে রেগে দশকথা শুনিয়ে দেবে। ওরা বলে খারাপ লোকের নজর পড়েছে, না হয় অপ-দেবতার দৃষ্টি। তাই ঝাঁকরি বসায়। পুজো দেয়। মানত করে পায়রা বা মুরগি।

তৈরি হয়ে নেয় শাইলি। যাওয়াই যাক না। এই কদিন থেকে কি যে হয়েছে তার, একা থাকতে গেলে হাঁপিয়ে ওঠে। একটুও ভালো লাগে না একা থাকতে।

পাঁচটা বাড়ি পেরিয়েই পাশংদের বাড়ি। বেশ হৈ-চৈ হুল্লোড় চারিদিকে। বহু লোক জড়ো হয়েছে। পাড়ার মেয়ের দল এটা ওটা করছে। ঘুরছে, হাসছে, গল্প করছে। ওরা যেতেই বসতে

দেয় মোড়ায়। তাকিয়ে দেখে শাইলি, খাটের ওপর শুয়ে আছে পাশং। কোথায় সেই হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান চেহারা! শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ফ্যাকাশে রঙ, শুধু বড় বড় গোল চোখছুটো মেলে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নেয় শাইলি।

চারিপাশে ধূপধুনো, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। সুগন্ধি বাতাস! সারি সারি প্রদীপ জ্বলছে। ফুলের মালা দুলছে। চালবাটা, গমবাটা, আরো নানা উপাচার, চন্দন, দই ঘি বাটিতে সাজান। সামনে বসে আছে ঝাঁকরি। জানে শাইলি ও কামি, দমাই বা তামাং শ্রেণীর লোক। তাদের সমাজের সবচেয়ে নীচু জাত। শাদা আলখেল্লা পরণে, মাথায় শাদা কাপড়ের পাগড়ি। চুপচাপ বসে আছে। চোখ বোজা। ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প।

নেউরি আস্তে আস্তে বললো—চিন্তা বসেও।

একটি বাচ্চা মেয়ে একটি থালায় সাজান গেলাস নিয়ে ওদের সামনে ধরলো। ভক্ করে একটা গন্ধ এলো নাকে। শাইলি মুখ ফিরিয়ে নিলো। পেতলের ওয়ান-গেলাস তুলে নিলো নেউরি—খানা, বহুৎ রামরো রকশি।

হইনা, খাঁদিনা। আপত্তি জানালো শাইলি।

অগত্যা নেউরি একাই চুমুক দিলো ওয়ান-গেলাসে।

হঠাৎ কেঁপে উঠলো ঝাঁকরি। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। ডানহাতে একটা ডুগডুগি। এবার সুরু হোল নাচ। মুখে অনর্গল মন্ত্র আওড়াচ্ছে, হাতের ডুগডুগি বেজে চলেছে অবিরাম, থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। চোখ দুটি বন্ধ। ঘুরে ফিরে প্রচণ্ড প্রলয় নাচ নাচছে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো—ভয় করছে।

মন্ত্র পড়তে পড়তে ডুগডুগি বাজিয়ে একই ভাবে পাকা দুঘণ্টা নাচলো ঝাঁকরি। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে রকশি ঢাললো মুখে। পুজো শেষ হোল। এবার একটা পায়রা হাতে নিয়ে তার ল্যাজ কেটে একটু সিঁদুর মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে উড়িয়ে দিল। ওর চোখের

দিকে তাকিয়ে অবাক হোল শাইলি। টকটকে লাল। দরদর করে ঘামছে। এখনো শরীরের কাঁপুনি থামেনি। একটা মুরগীর ডিম নিয়ে আলোর সামনে ধরে ফাটালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল। এবার পাশংএর বুড়ি মাকে ডাকলো ঝাঁকরি।

হাসিতে ওর মুখচোখ উছলে উঠলো—জাতি হুনছ, তেরো ছোরা জাতি হুনছ। ই হের। ভালো হবে, তোর ছেলে ভালো হবে। এই ত্যাখ।

পাশংএর বুড়ি মায়ের চোখমুখ ঝিকমিকিয়ে উঠলো আনন্দে। এবার সবার দিকে তাকিয়ে বললো ঝাঁকরি, ডিমের মধ্যে রক্তের মত চিহ্ন দেখেছে সে। পাশং-এর শরীরের রোগ ঐ ডিমের মধ্যে এনে দিয়েছে ঝাঁকরি মন্ত্রের জোরে। গড় হয়ে প্রণাম করলো ঝাঁকরিকে। পায়ের কাছে একটা পাঁচ টাকার 'নোট রাখলো। এবার যে-যার মত দুআনা চার আনা পুজো চড়ালো।

আবার মন্ত্র পড়তে পড়তে আসনে বসলো ঝাঁকরি। জানে শাইলি, এভাবেই রাতটা কাবার করবে। শেষ রাতে নাচতে নাচতে ডুগডুগি বাজিয়ে শ্মশানে গিয়ে ঐ ডিমটা পুঁতে রেখে আসবে ঝাঁকরি। আশ্চর্য! এত পরিশ্রমও সইতে পারে ওরা। নেউরিকে বললো আস্তে আস্তে, যাবি না?

হাই তুললো নেউরি—তুই যা, আমি পরে যাব।

বুঝলো শাইলি, মৌজ এসেছে ওর। এখন যাবে না। গলা জড়িয়ে এসেছে। উঠতে গেলেই পড়ে যাবে। আরো গেলাস দুয়েক গিলবে। পরের পয়সার রকশি পেয়েছে। শেষে বমি করবে তাও ভালো।

ঘুম পাচ্ছে শাইলির। বেশি রাত করলে যশবীরও চটে যাবে। ও বেরিয়ে এলো পায়ে পায়ে। তখনো হৈ হুল্লোড় সমানে চলছে বাইরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। কারো হাতে শেলরোটি।

ঘরে ফিরে দেখে যশবীর এসে গেছে। ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে নিজেই। তরকারি রাঁধাই আছে ও বেলায়।

—কোথায় গিয়েছিলি ?

—ঝাঁকরি দেখতে। পাশংএর অসুখ বেড়েছে।

—এবার এটাও মরবে। অনায়াসে বললো যশবীর।

ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো শাইলি। মুখে কথা সরলো না তার।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে উৎসবের দিন। সারাবছর এই সময়ের প্রতীক্ষায় থাকে সকলে। প্রায় প্রতি বাড়িতে রঙ লাগানো সুরু হয়। পথে দোকানে সর্বত্র চাঞ্চল্য। হাটের মাঝে দোলনা টাঙানো হয়েছে। নাগরদোলা। ওরা বলে রোটে পিঙ। এ-কোণে ও-কোণে বসবে জুয়ার আড্ডা। ডাইস। ছটা খোপ, মুকুট, ঝণ্ডা আর চার তাসের রঙ। তিন ঘুটি। প্রতি খোপে পয়সা রাখবে যার যেমন খুশি। চামড়ার টুপিতে ঢেকে ঘুটি নাড়িয়ে খুলে দেবে। যে তিনঘরে দান পড়বে তারা পাবে পয়সা, যাদের পড়বে না, তাদের পয়সা যাবে। তিন চারদিন রাত ভোর এই ডাইস খেলা চলবে। মারামারি ঝগড়া এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায় এখানে। একে পয়সার মায়া, তার ওপর নেশায় রঙিন মন ! হিমহিম বাতাস, ফুলে ফুলে প্রজাপতি। দিন তিনেক আগে থেকেই রাশ রাশ গাঁদা ফুল তুলে আনে সবাই। বড় বড় হলুদ-লাল গাঁদা। ওরা বলে শয়পত্রি। মালা গেঁথে ঘরের জানলা-দরজায় টানায়। কলাগাছ কেটে এনে বাড়ী সাজায়। নতুন জামা জুতো কাপড় কেনা সারা হয়। গাঁদা ফুলের সঙ্গে লাল পাতাবাহারের মালা গেঁথে টানায় শাইলি।

খুব ভোরে উঠে ভ্যাংলুমটা কাটে যশবীর। তিনদিন ধরে খাবে। এবার আর ভাগা দেবে না দুচারজনের বেশি লোককে।

শান্তবীর দ্রুত হাতে লোম ছাড়ায়। তার উৎসাহ কম নয়। নতুন টুপি, সুরুয়াল, কোট পেয়েছে তেওহারে। মনে মনে ঠিক করেছে একদিন রোটে পিঙ চাপবে, জুয়া খেলবে আর টোঁয়াট টানবে চুপিচুপি। লুকিয়ে জমিয়েছে ছুটো টাকা।

কালীপুজোর রাতেই ওদের লছমীপূজা। চারদিন ধরে যে তেওহার উৎসব চলে এটিই তার মূলদিন। প্রতি বাড়িতে অজস্র প্রদীপ জ্বেলে দেয় সন্ধ্যাবেলা। অমাবস্যার ঘনকালো রাতে সবুজকালো পাহাড়ে আলোর ফুলঝুরি। অপরূপরূপে সাজে পাহাড়।

সকাল থেকে শেলরোটি তৈরি করে শাইলি। কাঠের হামানদিস্তায়—বড় গাছের গুড়ি, যাকে ওখলি বলে—তাতে চাল গুড়ো করে, সেই গুড়োচাল দিয়ে জিলিপির মত প্যাঁচান বড় বড় রোটি ঘিয়ে ভাজা হয়। প্রতি উৎসবে-অনুষ্ঠানে শেলরোটি অপরিহার্য। আবার আছে মাংসরান্না। সারাদিনই কাজ রয়েছে। তবু ক্লান্ত হয় না। বরঞ্চ খুশিই হয় শাইলি। ছদিনের ছুটি নিয়েছে যশবীর। এখন ওকে হাজার টাকার লোভ দেখালেও কাজে যাবে না।

বিকেল হতেই তাড়া দিতে থাকে শাইলিকে। ছুপুরে বেশ বেলাতেই ভরপেট খাওয়া হয়েছে। তারওপর রকশি। এখনো নেশা কাটেনি। তবু বেরিয়ে পড়তে হবে। তৈরি হয়ে নেয় শাইলি। যশবীর আজ দেশি পোষাক পরে। দাওরা-সুরুয়াল টোপি। শান্তবীর আগেই বেরিয়ে গেছে সেজেগুজে, ঘরে তালা লাগিয়ে বেরোয় ওরা।

খুব খুশি হয় শাইলি। চারিদিকে আলো আর আলো। দোকানে নানা রঙের বাহার। কলাগাছ, দেওদার পাতা, শয়পত্রি ফুলে সাজান, তার মাঝে মাঝে রঙবেরঙের বিজলীবাতি। নানা ধরণের বাজি পুড়ছে পথে ঘাটে। ছুমদাম শব্দ। ফুলঝুরি, হাওয়াই, আতসবাজি তো আছেই, তাছাড়াও নানাধরণের।

পথে লোকে লোকারণ্য। এত ভিড় যে হাঁটাই যায় না। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরই পা টলছে। সোজা পথে চলতে পারছে না। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। গালাগাল দিচ্ছে। সকলেরই যেন ছুটি। কারো হাতে কোন কাজ নেই। কোন তাড়া নেই। সবাই আনন্দে মাতোয়ারা। বিভোর। অধিকাংশই বস্তিঅঞ্চল থেকে এসেছে শহরে। উৎসবে যোগ দিতে, ফুর্তি করতে। ঝলমলে পোষাক রঙিন জামাকাপড় আর মেয়েদের গা ভরা গয়না। যা তারা সারাবছরে এই একদিনই পরে। সরু গলির মধ্যেও আলো। রঙ মেখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। ওদিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় শাইলি। আজ ওদেরও উপার্জন ভালো হবে।

শরীর ভারি মনে হয়। এতক্ষণ হেঁটে হাপিয়ে পড়ে শাইলি। তবু মুখে কিছু বলে না। যশবীর নিজে থেকেই প্রস্তাব করে—চল তোকে বাড়ি রেখে আসি। আমি সারারাত বাইরে থাকবো আজ।

জানে শাইলি, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। চটে যাবে; কথা তো রাখবেই না। মিছিমিছি উৎসব-আনন্দের দিনে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে।

বাড়ি পর্যন্ত আসে না যশবীর। কাছাকাছি এসে বলে—যা, কাল ভোরে ফিরবো। দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়িস।

—'ডাইসে' হেরে গেলে আবার মারামারি কোরো না। সাবধান করে দেয় শাইলি।

—আমি হারবার ছেলেই নয়। গটগট করে হেঁটে চলে যায় যশবীর।

সবে ঘরে ঢুকেছে শাইলি, নেউরি এলো।—থাকিস কোথায়? সেই কখন থেকে খুঁজছি তোকে। খুব ফুর্তি করে বেড়াচ্ছিস বুঝি?

—একটু বেরিয়েছিলাম বাতি দেখতে। ভারি সুন্দর সাজিয়েছে রে। এত রঙ, এত আলো!

নে চল এখন, ওরা সব তৈরি হয়ে বসে আছে। তোর জন্যে বেরোয় নি এতক্ষণ। তাড়া দেয় নেউরি।

—কোথায়? ওর দিকে অবাক চোখে তাকায় শাইলি।

—কেন, ভইলো খেলতে! যেন ওই বেশি অবাক হয়েছে এমন ভাব করে নেউরি।

—বড় ক্লান্ত লাগছে রে। অনেক ঘুরেছি। মুখে ক্লান্তির ভাব ফোটে ওর।

—তবু বছরের একটা দিন। তুই না হয় একবাড়ি থেকে ঘুরে আসবি। ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে তোর জন্যে। কাতর অনুনয় করে নেউরি।

উঠে দাঁড়ায় শাইলি,—চল।

বসে বসে গল্পগুজব করছিল ওরা। খিলখিল হাসি, ঠাট্টা, এ ওর গায়ে গড়িয়ে-পড়া দেখে বুঝলো শাইলি, সকলেই অল্পবিস্তর যাঁড় বা রকশি টেনেছে। এবার ওকে জোর করবে খাওয়ার জন্যে। সুস্তলি, বুধু, ওকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। —এসেছিস? চল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দল বেঁধে সুর করে গান গায় ওরা। ভইলো-গান। আজ আমরা শুভদিনে তোমার বাড়ি এসেছি, তোমার মঙ্গলকামনা করতে। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখো, তাহলে অসুখ-বিসুখ করবে না। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ গেয়ে পয়সা বা চাল দক্ষিণা নিয়ে চলে যায় অন্য দুয়ারে। একটা বাড়িতে গান শেষ হতেই শাইলি বলে নেউরিকে—আমি যাইরে। খুব ঘুম পাচ্ছে।

—চুপচাপ সরে পড়! ওরা জানলে ছাড়বে না, টানাটানি করবে। আজ তো সব বেহুঁস। চুপি চুপি বলল নেউরি। পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে শাইলি। যা ঘুম পেয়েছে। খিদেও নেই আজ। শান্তবীরও ফিরবে না রাত্রে। চোলিমুজেত্র খুলে শুয়ে পড়ে। একা ঘরে লজ্জার কি আছে। তাছাড়া গরমও লাগছে খুব।

এবার ভাইটিকা। বোন-দিদি ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবে। পঞ্চরঙের ফোঁটা। লুকিয়ে মকাই পুতে রাখে বোন। সবে অঙ্কুর বেরিয়েছে এমন অবস্থায় তুলে এনে পুড়িয়ে সেই গুড়ো ভাইয়ের অজ্ঞাতসারে তার মাথার চুলের আড়ালে ছোট্ট করে লাগিয়ে দেয়। এতে কোন খারাপ দৃষ্টি পড়বে না ভাইয়ের ওপর। এবার একটা বড় আখরোট দরজার বারে রেখে একবাড়িতে ভাঙতে হবে। তারপর সেটি বাড়ি পেরিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে হবে পেছন দিকে। কারো খাওয়া চলবে না ঐ আখরোট। ওটা-তো আখরোট নয়, রাক্ষসের মাথা। ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যে বোন ঐ রাক্ষসের মাথা ভেঙে জীবনের পথ পরিষ্কার করে দেয়।

যশবীর বলে শাইলিকে—তুজনেরই সমান অবস্থা কি বল? তুটো ফোঁটাই বাদ গেল আমাদের। কপালটাও ফাঁকা রয়ে গেল।

—কেন, তোমার তো খুড়তুতো-মাসতুতো বোন অনেকগুলো রয়েছে। গেলেই পারতে! মুচকি হাসে শাইলি।

—ওরে বাপস্। চোখ বড় করে যশবীর—তাহলে আমায় দেড় ডজন বোনকে পয়সা দিতে গিয়ে একেবারে কুপোকাৎ।

—ওঃ সেজন্যেই বুঝি যাওনি কোথাও। যা কিপ্পিন হয়েছ! এবার তো অনেক টাকা জিতেছ, না হয় তার থেকেই খরচ করতে কিছু। মিটিমিটি হাসলো শাইলি।

—হুঁ, সব খরচ করে ফেলি আর কি। তুদিন পরেই তো খরচের দিন আসছে! আমরা তুজনেই বেশ আছি কি বল। তুহাতে ধরে কাছে টানে ওকে।

—আঃ ছাড়ো! ধমক দেয় শাইলি।—দিনেতুপুরে তোমার ইয়ে। যতদিন যাচ্ছে, বুড়ো হচ্ছ, ততই যেন বাড়ছে। এখুনি শান্তবীর আসবে।

—ওকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরায় যশবীর।

অভিমান হয়েছে! মনে মনে হাসে শাইলি। ভালোই হয়েছে। যা জ্বালাতন করে। যতক্ষণ ঘরে থাকবে আর কোন কাজ নেই ওর। বাইরে বাইরে থাকে, সেই ভালো! তখনি মনে হয়, না, না; থাকুক, বেচারী কদিনই বা ছুটি পায়, ঘরে থাকতে পারে? সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাহাড় পথের বাঁকে বাঁকে চোখ-কান-মন সজাগ রেখে গাড়ি চালায়। ঐ দশাইয়ে দুদিন আর এই তেওহারে সপ্তাহখানেক একটু ছুটি পায়, হৈ চৈ, ফুর্তি আনন্দ। বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আসে।

এবার আরম্ভ হয় দেউশি খেলা। তিনদিন ধরে চলবে। ছেলেবুড়ো সকলে মেতে ওঠে। ভাইটিকাতে ফোঁটা পেল না যশবীর, মন খারাপ ছিল। দেউশি খেলে পুষিয়ে নেবে মনের দুঃখ। জুয়োতে এবার হারেনি, এই একটা মস্ত আনন্দের কথা! শাইলিও ভইলোর পয়সার ভাগ পেয়েছে। গোটা তিনেক টাকা। নেউরি এসে দিয়ে গিয়েছে। প্রথমে নিতে চায়নি শাইলি। সে-তো মাত্র একটি বাড়িতে গিয়েছে। ছাড়েনি নেউরি—তাতে কি, তুই-তো আমাদের দলে ছিলি।

এক এক দলে তিনজন, চারজন। ছোট ছেলেদের উৎসাহই বেশি। গলায় সবার হলুদ-গাঁদার মালা। একজনের হাতে লাঠি। দলপতি। মূল গায়েন। জোরে জোরে ঘুরে গান গায় ওরা। মূল গায়েন আরম্ভ করে—ঝিলিমিলি, ঝিলিমিলি, সকলে সমস্বরে একবার বলে—দেউশিরে। এইভাবে চলে গান আর ধুয়ো। ইচ্ছেমত টেনে লম্বা করে নেওয়া চলে, আবার ছোট্ট কয়েক কথায়ও শেষ করা যায়। বছরের এই শুভদিনে তোমাদের বাড়িতে এসেছি। এত টাকা তোমাদের! কত পয়সা ইঁদুরেও নিয়ে যায়। তার থেকে সামান্য কিছু আমাদের দাও। আমরা তো নিজেরা আসিনি, স্বয়ং বলিরাজ পাঠিয়েছেন আমাদের। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোরে দোরে ঘোরে।

বেশ লাগে শাইলির এই সুর করে বলা ছোট ছোট ছেলেদের দেউশি গান। পাঁচ টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে খুচরো করে রেখেছে সে। দল দেখে, লোক বুঝে দিতে হবে তাদের।

'শান্তবীরেরও ক্লান্তি নেই। বাদাম বিক্রি কাজ ওর। খোঁড়া পায়েই দলের সঙ্গে ঘোরে। বেশি বড় দলে যায় না, ভাগে কম পড়বে। সে শুনে নিয়েছে দেউশির আসল মানে। সেই বলিরাজার গল্প। কৃষ্ণ বলেছিলেন, কোথায় রাখবো পা? মাথা পেতে দিয়েছিলেন বলিরাজা—দাও শিরে। আমার মাথায় রাখো।

বড়রা দল বেঁধে বেরোয় বেশি রাতে। বেশ বড় দল। সঙ সাজে কেউ, কেউ বা শাড়ি পরে মেয়ে সাজে, পায়ে ঘুঙুর বাঁধে। হাত-পা ঘুরিয়ে নাচে। মাঝে মাঝে বোতল খুলে গলায় ঢালে রকশি। না হলে দম্ ফুরিয়ে যাবে। একজন গলায় ঝোলায় হারমোনিয়াম। গান গায় মনের আনন্দে। মাদল বাজায় একজন নেচে নেচে। তা ধিন তা, তা ধিন তা। তালে তালে পা ফেলে নাচে আর সুর তোলো—ঝিলিমিলি, ঝিলিমিলি।

দুদিন দুরাত চলে ওদের দেউশি-খেলা। নাওয়া-খাওয়া বাড়িঘর সব ভুলে যায়। তারা যেন অনাদি কাল থেকে এমনি ভাবে নেচে-গেয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে। তারা এই কর্মময় পৃথিবীর কেউ নয়, কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই কোন।

দলের কর্তার কাছে পয়সা জমা হয়। ওরা নেচে গেয়ে বেড়ায়। অবশেষে নেশা কেটে যায়। এবার সুরু হয় পয়সা ভাগাভাগি। তখন সবাই ভুলে যায় বন্ধুত্ব, ভুলে যায় উৎসবের আনন্দ। একটু এদিক ওদিক হলেই প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর গালাগালি ওঠে হাতাহাতিতে। অবশেষে ওঠে কোমরের খুকুরি। রক্তারক্তি, খুনোখুনি। থানা—পুলিশ। ছাড়া পেয়ে যায় দুএকদিনেই। ঠাণ্ডা মাথায় নয়, মদের ঝোঁকে কি যেন কি হয়ে গেছে। আমি কি ওকে মারতে পারি? ও—আমার কতদিনের পুরোনো বন্ধু।

হায় হায় এসবই ঐ বেইমান রকশির কারসাজি। এবার আরম্ভ হয় হু হু কান্না। কি হবে আমার! কত পাপ করলাম। এই প্রতিজ্ঞা করছি খুকুরি ছোঁব না, কোমরে গুঁজবো না আজ থেকে। ওদিকে ডুকরে কাঁদে সগুবিধবারা। যাদের বরের গলায় কোপ পড়ে দুফাঁক হয়েছে। আর যারা, ফিরবে না কোনদিন! তবু এই কান্নাই বা কদিনের? আবার নতুন ঘর খুঁজবে ওরা কদিন পর থেকেই।

শান্তবীরই খবর দেয়, এবার নাকি ডুমারাম বস্তির কালু মঙ্গরকে কোপ বসিয়েছে বাজারের দলবীর থাপা। দশটাকা সরিয়েছিল নাকি। বলে শান্তবীর—ভালোই হয়েছে, বড় পাজি লোক ছিল ঐ কালু মঙ্গর। বন্ধকী কারবার করে কতো লোকের যে সর্বনাশ করেছে! ও মরায় ভালোই হয়েছে!

—আঃ থাম, ও কথা বলতে নেই। ধমক দেয় শাইলি। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কালু মঙ্গরের তৃতীয় পক্ষের বৌ কমলির মুখখানা। এই তো গেল মাসে মেয়ে হয়েছে ওর। ঐ কমলির সঙ্গে পইরোতে কাজ করেছে শাইলি। দুই নম্বরেব বড় পইরোতে।

যশবীরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। প্রায় একসপ্তাহ ধরে চলে তেওহার উৎসব। প্রতিদিন, মদ মাংস শেলরোটি। ধকলই কি কম যায় শরীরেব ওপর। বছরের অন্য সবকটি দিন থেকে এ কটি দিন আলাদা। তবু রক্ষে এই কটি দিন অন্যরকম! চিরাচরিত নিজের কাজের থেকে তো ছুটি! গাই-তেওহার, কাক-তেওহার, কুকুর তেওহার, লছমীপূজা, ভাইটিকা, দেওশি-মিলিয়ে এই তেওহারের কটি দিন তাই উৎসবের দিন, ছুটির দিন। আবার তো সেই কাজ আর কাজ! একঘেয়ে একটানা, বলদের গাড়িটানা!

সেই একঘেয়ে দিন ফিরে এলো। গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীন। শুধু একটা অবসাদ। অনেক রাত দিনের অবসরহীন শ্রমের পর যেমন ক্লান্তি নামে, তেমনি এক অবসাদ। শরীরে ঢল নেমেছে

আরো। চামড়ার দুধ আলতা রঙ যেন ফেটে পড়ছে। হাই ওঠে যখন-তখন। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তবু কাজ করে শাইলি। বসে থাকলে তো চলবে না। তাছাড়া খাটলেই নাকি শরীর ঠিক থাকবে।

তিনটে মাফলার, ছোট ছোট্ট সোয়েটার গোটাকয়েক মোজা চারজোড়া তৈরী করে রেখেছে শান্তবীর। এখন অনেকদিন আর ধরে না বোনা। বাদাম বিক্রিতেই মেতে উঠেছে।

যশবীর বললো ওকে—মটরের কাজটাজ শেখ; করে খেতে হবে তো!

—মেরো খুট্টালে হুঁদেইনা। মাথা নীচু করে জবাব দিলো শান্তবীর।

ওর পায়ের দিকে চেয়ে চুপ করে যায় যশবীর। এখন অনেকটা উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে, তবু ধনুকের মত কিছুটা বাঁকা হয়ে চলাফেরা করে। একেবারে সোজা হতে পারে না। হয়ত আরো বয়েস বাড়লে কিছুটা ঠিক হবে। ছোটবেলায় যা ছিল তার চেয়ে ভালো হয়েছে অনেক।

দোলমা আসেনা বিশেষ। নেপটি দোকান নিয়ে ব্যস্ত। বড়-লোক হচ্ছে। দমিনিটা তো মরেই গেল। এখন বন্ধু বলতে ঐ নেউরি। খোঁজখবর নেয়। তাও কাছাকাছি থাকে বলেই ওর সুবিধে। মাঝে মাঝে আসে ধনমায়া ভাউজু। তা ও বুড়ির সঙ্গে কি আর মনের কথা বলা যায়! না, ভালো লাগে! আর এক আছে যন্তরে বাজে। হাজার কাজ থাকুক, ঝড়বৃষ্টি যাই হোক না, ও ঠিক আসবে।

একটা প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের বিস্ফোরণের মত ওকে ধাক্কা দিল কথাটা। বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে রইল শাইলি। এসে কি শুনছে! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না আর। এতদিন যে ভয়ের কালো পশুটাকে মনের কোণায় পুষে বারবার তাড়াবার

চেষ্টা করছিল, সেটাই হঠাৎ একলাফে একেবারে চোখের সামনে এসে নির্লজ্জের মত দাঁত বার করে হাসছে। যেন একটা মস্ত নেকড়ে তাকে কামড়িয়ে ছিঁড়ে খাবার জন্যে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। ধমনীর রক্তধারা যেন এখুনি স্তব্ধ হয়ে যাবে। দাঁড়াতে পারছে না শাইলি। মুখে কথা ফুটছে না। কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ।

একেবারে ভুলেই গেছিল জলাপাহাড়ের কথা। বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল শাইলি। অষ্টপ্রহর আর কানের কাছে জলাপাহাড়ের নাম করে না কেউ। ট্রেন আসে যায় সৈন্য বোঝাই। গা সহা হয়ে গিয়েছিল।

—এতে ভয় পাবার কিছু নেইবে। হাসলো যশবীর। এত ভালো একটা কনট্রাক্ট্ জুটে গেল। একটা বছরের ব্যাপার মাত্র। দেখতে দেখতে কেটে যাবে!

—আমি একা কি করে থাকবো? কোন রকমে উচ্চারণ করে শাইলি।

—একা কোথায়! নেউরি আছে দেখাশুনো করবে। শাস্ত্রবীব আছে। আমাদের যন্তরে বাজে আছে। মাসের প্রথমে টাকা পাঠাবো আমি। এবার চোখ টিপে হাসে।—তাছাডা একা কোথায়! অল্পদিনের মধ্যেই তো তুজন হবি।

ওর রসিকতায় এখন আর হাসতে পারে না শাইলি। সেই ভয়েই তো শিউরে ওঠে। কত সাধ, কত ইচ্ছে। সব যেন মাথা কুটে মরে ও তুটি পায়ে। সে জানে একবার যখন জলাপাহাড়েব ডাক শুনেছে আর ওকে ফেরানো যাবে না। বাধা দেওয়া যাবে না যশবীরকে। তাছাড়া ও যা একগুঁয়ে! যা যখন নিজে ভালো বুঝবে তা করবেই।

—তোর ছেলের জন্যেই তো কপালটা খুলে গেল। ও খুব পয়মন্ত। জন্মাবার আগেই ভাগ্য ভালো হতে আরম্ভ করেছে।

না হলে এমন হয় কজনের বল্ দেখি! তাছাড়া ওর জন্যেই তো টাকার আরো বেশি দরকার আমাদের। এই কিরাই করা বাড়িতে আর থাকবো না। নিজে বাড়ি করবো। গাই কিনবো, বারি বানাবো। আমার ছেলেকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবো শাইলি। তাকে দুঃখ পেতে হবে না। এমনি করে খেটে খেতে হবে না। ড্রাইভারি করবে না সে, পল্টনে যাবে না, আফিসে বাবু কাজ করবে। মাত্র একটা বছর কষ্ট করে থাক। প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে শাইলিকে!

বুঝেও বুঝতে চায় না শাইলি। দুচোখের কোণে জল এসে পড়ে তার। আপন মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। একটা শক্তিশালী বড় গাছকে ঘিরে অনেক উঁচুতে উঠেছে বুনোলতা, সবে কুঁড়ি ধরেছে, ফুল ধরলো বলে, তখন যেন কে নির্মম ভাবে কেটে দিল সেই লতার গোড়াটা। ফুলে ফুলে কাঁদে শাইলি।

তবু মত বদল হয় না যশবীরের। মিষ্টি কথায় বোঝায় ওকে, ভোলায়, সান্ত্বনা দেয়, আশার বাণী শোনায়। যশবীর বলে যায়, নিরুত্তর শাইলি শোনে। কথা বলে না, কাঁদে।

শেষে ষ্টেশনে আসতে হয় ওকে একদিন। যন্তরে আসে, শান্তবীরও। যশবীরের গলায় পরিয়ে দেয় গাঁদা ফুলের মালা। তামার কমণ্ডুল থেকে জল ছিটিয়ে দেয় গায়ে। যশবীরের হাসিও কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। অকস্মাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ে সে। মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনেক কষ্টে সামলিয়ে নেয় নিজেকে। বলে চিঠি দেবে গিয়ে। কতই বা দূর কোহিমা-ইম্ফল? তার মত অনেকেই তো যাচ্ছে। আরো, আরো দূরে।

যন্তরেকে বলে যশবীর—হেরনু বাজে। তিমেরুকো মা রাখের যাঁদেইছু।

শান্তবীরের হাতে পাঁচটাকার নোট দেয় একটা—রামোরি ধসনু। বাইরো বেশি ন ডলনু।

—ল। শুনছ। কেঁদে ফেলে শান্তবীর। ওর পিঠে হাত রেখে শাইলির দিকে তাকায় যশবীর। বিমর্ষমুখে তাকিয়ে আছে। চোখদুটি ছলছল।

ইঞ্জিনে ভোঁ বাজে। গার্ড হুইশেল বাজায়। ট্রেন ছাড়ে। লাফিয়ে কামরায় উঠে পড়ে যশবীর। দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে এদের দিকে। যতক্ষণ দেখা যায়! ওরাও দাঁড়িয়ে থাকে। তিনজোড়া অপলক চোখ। এঁকেবেঁকে চলতে চলতে ভট্ট শিঙের ওপাশে চলে যায় ট্রেন। আর দেখা যাবে না। নিঃশব্দে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় ওরা তিনজন। কী এক শূন্যতার হাহাকাব ওদের মনে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে বুকফাটা কান্নায় আকুল হয়ে ওঠে শাইলি। এ আজ কি হোল আমার? নিজেই অবাক হয় শাইলি। কেন আজ এত কাঁদছি আমি? কেন, কেন? কি লাভ কেঁদে? একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ও চিঠি লিখবে, টাকা পাঠাবে। কত লোকই তো গিয়েছে, যাচ্ছে। সবাই তো কই তাদের জন্যে আমার মত এমনি করে কাঁদছে না। নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দেয় শাইলি।

এর চেয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকা ভালো। মন অন্যমনস্ক থাকে। উঠে পড়ে শাইলি।

কাজ বেড়েছে যন্তরের। সকাল হোক, দুপুর হোক, সন্ধ্যে, রাত যখনই হোক দিনে একবার করে আসবেই সে। খোঁজখবর নেয়, কিছু দরকার আছে কিনা জেনে নেয়। চা খায়, গল্প করে, আশা ভরসার কথা বলে। বাজার করে শান্তবীর। বেশি কিছু নয়। ডাল, আলু, রাইশাক, সিমি, কাখনো বা সিদ্রা। দুপুরে এক ছুটে এসে ভাত খেয়েই চলে যায়। বাদাম বিক্রি 'ভালোই চলছে তার। আর আসে নেউরি।' যখন-তখন, সবসময়েই।

যশবীরের প্রথমে চিঠি এলো, এক সপ্তাহের মাথায়। নেউরিকে

সঙ্গে নিয়ে ধনমায়া ভাউজুর কাছে যায় শাইলি। হাসে ধনমায়া। পড়ে শোনায় চিঠি।—আর একবার পড় ভাউজু। অনুরোধ করে শাইলি। কাগজ খাম এগিয়ে দেয়। আজই জবাব লিখতে হবে। ভালোই আছে সে। যেন চিন্তা না করে যশবীর। পাড়ার সবাই দেখাশুনো করছে। যন্তরে বাজে আসে। সব খবর বলে যায় শাইলি। ধনমায়া লিখে যায়।

—একবার পড়ে শোনাও ভাউজু। কিছু বাদ গেল নাতো!

—আচ্ছা মেয়ে বটে। হাসে ধনমায়া। এমন বরসোহাগী মেয়ে দেখিনি বাপু।

মুখ নীচু করে হাসি লুকোয় শাইলি। নিজের ব্যাকুলতায় নিজেই লজ্জা পায়।

প্রথম মাসে একশ টাকা মনি অর্ডার এলো শাইলির নামে। আর একটি চিঠি। লিখেছে, সব যেন খরচ না করে। জমিয়ে রাখে। যদি নিজের কাছে রাখতে ভয় পায় তাহলে যেন ধনমায়া ভাউজুর কাছে রাখে। পরের মাসে আরো বেশি টাকা পাঠাবার চেষ্টা করবে। তখন যেন নিজের পচ্ছন্দমত একটা গয়না গড়িয়ে নেয় শাইলি। নেউরি খুব খুশি হয় চিঠি শুনে। শাইলিও খুশি। তবু তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে শুনতে শুনতে।

হিমেল হাওয়া বইতে সুরু করে। কিছুক্ষণের জন্যে উঁকি দিয়েই হারিয়ে যায় সূর্য। পাতায় পাতায় শিরশির, ঝাউ-পাইনে মর্মর। আবার শীত আসে।

রান্নার কাজে সাহায্য করে নেউরি। অল্পেতে হাঁপিয়ে ওঠে শাইলি। বাইরে বেরোয় না একদম। শান্তবীর দুবেলা রাস্তার কল থেকে জল বয়ে আনে। ভাবে শাইলি, এ সময় যদি থাকতো যশবীর, কত ভালো হোত। যন্তরে আসে, গল্প করে, চলে যায়।

—চা খাবে না বাজে! বিছানা থেকে উঠতে যায় শাইলি।

—খাব। তুই শুয়ে থাক, আমি করে নিচ্ছি। নিজেই উনুনে জল চাপায় যন্তরে।

সেই ভোর রাত থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করছে শাইলি। দরজার বাইরে চুপচাপ বসে আছে যন্তরে। কি করবে, কি সে করতে পারে ভেবে পায় না। একমনে পশুপতিনাথকে ডাকে। আজ শান্তবীর বাদাম বিক্রি করতে যায় নি। একটু দূরে পায়চারি করছে। যদি দরকারে লাগে। খোঁড়া পা, তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে, বসে থাকতে পারছে না সে। ধনমায়া আর নেউরি ভেতরেই রয়েছে। সেই ভোরেই ওদের ডেকে এনেছে শান্তবীর।

একবারও ওঠেনি যন্তরে। আজ আর খাওয়া দাওয়ার কথা মনে নেই তার। পকেট থেকে কটুয়া বার করে টানে একটার পর একটা। সন্ধে হয়ে গেছে একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসছিল এতক্ষণ। কিছুক্ষণ হল সে শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে না। শান্তবীর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে দোরগোড়ায়। দুপুরে তারও খাওয়া হয়নি কিছু।

কান খাড়া করে থাকে যন্তরে। হঠাৎ আঁতকে ওঠে শিশু-কণ্ঠের কান্নায়। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আনন্দে নেচে উঠতে চায় সে। সর্বাঙ্গ কাঁপে রোমাঞ্চ পুলকে। ছুটে যেতে চায় ভেতরে। জোর করে ধরে রাখে নিজেকে। আপনমনে হেসে ওঠে। দুচোখ বুজে যায় তার।

ধনমায়া বেরিয়ে আসে—ছোরা ভয়ো বাজে।

—হুনুই পড়ছ, হুনুই পড়ছ। বহুৎ ঠুলো হুনছ, হেরনু তিমেরু আমি জানতাম ছেলে হবে। ও খুব বড় হবে, দেখে নিও তোমরা। খুশিতে গলা বুজে আসে যন্তরের।

এ এক মজার খেলা হয়েছে যন্তরের। দিন নেই, রাত নেই

নিজের কোন কাজের কথা মনে থাকে না ওর। সারাদিন ঐ ছেলে নিয়ে খেলা। ওকে কোলে তুলে আদর করে, আপনমনে কথা বলে, হাসে। ওর স্নেহের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে বাচ্চাটা। তাড়াতাড়ি ওকে শুইয়ে দেয় বিছানায়। কৈফিয়তের সুরে বলে—মো কুটেনা, তেসই রুঁদেইছ।

হাসে শাইলি। সে জানে বাচ্চা ছেলেকে মারতে হয় না, ব্যথা দিতে হয় না, ওরা অকারণে কাঁদতে জানে।

গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, হাসে আপনমনে। ফরসা, টকটকে গায়ের রঙ। শুধু চুল কম মাথায়। অবাক চোখে ওর দিকে তাকায় শাইলি।

—ওর নাম হবে রণবীর, হাসে যন্তরে। পকেট থেকে সস্তা দামের খেলনা বার করে রাখে ওর পাশে।

—ওসব অপনি কেন কিনলে বাজে? ভুরু কুঁচকে ধমক দেয় শাইলি।

জবাব দেয় না যন্তরে। মাথা নীচু করে মিটমিটিয়ে হাসে।

চিন্তিত হয় শাইলি। নেউরিও তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কারো মুখেই কথা ফোটে না। যথাসময়ের চেয়েও একসপ্তাহ বেশি কেটে গেল, অথচ না এলো যশবীরের চিঠি, না এলো টাকা। এদিকে টাকার প্রয়োজন খুব বেশি! যা হাতে ছিল শেষ হয়ে এলো প্রায়। লিখেছিল যশবীর, সামনের মাসে আরো বেশি সেই আশাতেই ছিল শাইলি। তাছাড়া এমন একটা খবর দিল তারও কোন উত্তর নেই।

—আর একখানা চিঠি লেখা যাক। হয়ত ব্যস্ত আছে খুব। যুদ্ধের কাজ, বলা তো যায় না। অন্য কোথায়ও যেতে হতে পরে দুচারদিনের জন্যে। সান্ত্বনা দেয় নেউরি। তবু নিজের মনেই যেন ভেবে পায় না। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে তার মুখে-চোখে।

—তাই চল, ভাউজুর কাছে। একখানা চিঠিই লেখা যাক। মৃদুকণ্ঠে বলে শাইলি।

দুসপ্তাহ, তিন সপ্তাহ করে পুরো মাস কাটলো, আশায় আশায় পথ চেয়ে। তবুও কোন সাড়াশব্দ নেই। এবার ভেঙ্গে পড়লো শাইলি।

—কি হবে বাজে ?

—কিছুক্ষণ চুপ করে রইল যন্তরে। মনে মনে ভাবলো কি যেন। এবার তাকালো ওর দিকে—নিশ্চয়ই কোন অসুবিধাতে পড়েছে যশে। তা এক কাজ করা যাক না? আমি আর বুড়োবয়সে কেন হাত পুড়িয়ে রান্না করি। রোজ রোজ ভালোও লাগে না। তোর এখানেই দুবেলা দুমুঠো খেতে দিস। পকেট থেকে নোটে রেজকিতে মিলিয়ে গোটা পাঁচেক টাকা বাব করে ওর হাতে দিল যন্তরে!

অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করলো শাইলি। পারলো না। ঠোঁট দুটো ফুলে উঠলো, দুচোখ ছাঁপিয়ে জল নামলো তার।

কুয়াশার অবগুণ্ঠনে দিক দিগন্ত ঢাকা। দেখা যায় না গাছ পাথর, পাহাড় ঝর্ণা। শরীরে কাঁপুনি ধরে। আর এক শীত এসে গেল। আবার আগুন জ্বালতে হবে। আঙাঠির চারপাশে গোল হয়ে বসে হাত-পা-মুখ-মাথা গবম রাখতে হবে। শীতের রোগ চিলব্লেনে ফুলে লাল হয়ে উঠবে হাত-পায়ের আঙ্গুল, নাকেব ডগা, কানের পাতা। তার ওপর চুলকোবে খুব। সে এক জ্বালা। ঘুমপাহাড়ে বরফ পড়বে। সেই হাওয়া এসে হাড রক্ত ঠাণ্ডা করে দেবে।

নিঃশ্বাস ফেলে শাইলি—কয়লা কোথায় পাব এবার ? আঙ্গাঠি জ্বালবো কেমন করে ? ঘরে বাচ্চা ছেলে, এই শীতে আগুনের তাত না পেলে রক্ত জমে বরফ হয়ে যাবে যে।

—কেন, শান্তবীর ইঞ্জিনের কয়লা থেকে কুড়িয়ে আনবে কিছু,

তাছাড়া আমি তো আছিই। ভরসা দেয় যন্তরে। তবু যেন মন মানে না শাইলির।

প্রতীক্ষায়, আশা-আশঙ্কায় আর একটা মাস কেটে গেল। কেঁদে কেটে শীর্ণকায় হয়ে পড়লো শাইলি! ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই তার। কি হল? এমন তো হবার কথা নয়। টাকা না পাঠাক, অন্ততঃ একটা চিঠি লিখুক। তার খবরটুকু পাই যে সে ভালো আছে। তবু জানবো সে আসবে। কত আশা তার। নতুন বাড়ি তৈরি করবে, গাই কিনবে, বাগান বানাবে। কত সাধ ছিল ছেলে হবে। তাই হল। ছেলেকে মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে। তবে কোথায় সে? কেন তার খবর নেই কোন?

—এর চেয়ে যদি তুই একবার জলাপাহাড়ে খবর নিতিস্—

—না, না, না—চিৎকার করে কানে হাত চাপা দেয় শাইলি।

নেউরিকে কথা শেষ করতে দেয় না। বারবার মনে হয়েছে তার ও কথা। ও-নাম সে মুখে আনতে চায় না, মনে করতে চায় না। সে জানে ওখানে খোঁজ করলে খবর একটা পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি সে খবর এমন নিদারুণ হয় যে সে সহ্য করতে পারবে না! যদি সে খবর—তার চেয়ে এমনি আশায় আশায় তার জন্যে দুঃখকষ্ট সহ্য করে দিনগোনাও ঢের ভালো।

জলাপাহাড়—ঐ বুড়ো, নিষ্ঠুর, হিংস্র নির্দয় জলাপাহাড়। এক ফোটা জল নেই ওখানে। ও শুধু জ্বলছে। ক্ষিদের আগুনে জ্বলছে দিনরাত। ও নাম সহ্য করতে পারেনা শাইলি। সে খুশি হয় যদি সকালে উঠে দেখে জলাপাহাড়ের উঁচু শুক্‌নো মাথাটা মাটিতে মিশে গিয়েছে। এত লোকের চোখের জলের অভিশাপ বয়ে আজো কি ভাবে ও উঁচু মাথায় খাড়া আছে সেটাই আশ্চর্য।

দুহাতে শাইলির ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বলে যন্তরে—তুই কিছু ভাবিস না নানি। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি কোন কষ্ট হবে না।

রণবীরের। এই ছ্যাখ, চারকুড়ি তিন বয়েস হলেও, এখনো দাঁত পড়েনি আমার, চুল সব পাকেনি, চোখেও দেখতে পাই। গায়ের চামড়া একটু চেশি কুঁচকে গেছে মাত্র। তাছাড়া গায়ে এখনো তাগৎ আছে। ওকে আমি বড় করে তুলবো। তুই চিন্তা করিস না। বিভোর হয়ে ওকে নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে।

ফ্যাকাশে হাসি হাসে শাইলি। কি জবাব দেবে? সে জানে কত ভালোবাসে যন্তরে ওদের। ওর এই বুড়ো বয়সেও কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই না করছে।

অন্ধকার হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ছোট ঢিবরি জ্বলছে মিটমিট করে। আঙ্গাঠির আগুন লাল হয়ে হয়ে উঠেছে। গোল হয়ে বসেছে ওরা। যন্তরে, শাইলি, শান্তবীর।

যন্তরের কোলে বসে হাত-পা নাড়িয়ে খেলছে রণবীর। শান্তবীর আর শাইলি আপনমনে বুনে চলেছে মোজা, সোয়েটার। বিড়বিড় করছে যন্তরে একাই। যত মনের কথা, সাধ আশার কথা উজাড় করে বলছে রণবীরকে। কোন জবাব পাক না পাক, বলেই যেন তার আনন্দ।

দরজার বাইরে ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল। কান খাড়া করলো শাইলি। কে এলো আবার এসময়ে। বুকটা হঠাৎই কেঁপে উঠলো একবার।

এবার কে যেন টোকা দিল দরজায়। মৃদু অথচ স্পষ্ট।

—কে এলো আবার! মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে ছেলেকোলেই উঠে দাঁড়ালো যন্তরে। বাইরে চলে গেল। দরজা খোলার শব্দ পেলো ওরা। শাইলি শান্তবীরের মুখের দিখে চাইল। শান্তবীর বোবা চোখ মেলে চেয়ে রইল।

—তুই, তুই আবার এখানে কেন? চাপাস্বরে বকছে যন্তরে। ক্ষীণ আশার সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল ছিঁড়ে গেল মুহূর্তে। দেহের সব রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আর কোন কথা কানে এলো না

ওর। যন্তুরের পেছনে কার জুতোর শব্দ এগিয়ে এলো ক্রমশঃ। দরজার দিকে তাকালো শাইলি।

প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিল শাইলি। হাত থেকে খসে গেল উলের গোলা, কাঁটা। অভাবনীয় বিস্ময়ের আকস্মিক ধাক্কায় অনড়, নিথর নিশ্চল বসে রইল শাইলি। মাটির দিকে দুচোখ রাখলো। একবার মুখ তুলে দেখলো শান্তবীর। আবার নিজের কাজে মন দিল।

বিশীর্ণ হাসি হাসলো শুকুলাল।—তোর কাছে মাপ চাইতে এসেছি শাইলি। রাগ করিস না, আমার কাথাগুলো শোন। গলায় অজস্র স্নেহ ঝরলো তার। দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে শাইলির দিকে তাকিয়ে বলে চললো সে—তুই আমার ছেড়ে আসার পরই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তোকে অনেক মেরেছি, জ্বালাতন করেছি, তার সাজা আমি পেয়েছি। তুই আসার পর আমি আর ঘর বাঁধিনি। সেই থেকে ঘাঁড়-রকশি ছেড়ে দিয়েছি। দশাই-তেওহারেও ছুঁইনি। আমায় মাপ কর তুই। তোর এখন কত কষ্ট, আমি সব জানি, সব খবব রাখি। শুধু লজ্জায়, ভয়ে কাছে আসতে পাবিনি। যদি তুই রাগ করিস, তাড়িয়ে দিস। আজ জোর করে চলে এলাম। এবার ওর পাশে বসলো শুকুলাল। যন্তরে রণবীরকে কোলে নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। তবু মুখ তুললো না শাইলি। মাটির দিকে তাকিয়ে একই ভাবে বসে আছে।

—চল, আমার সঙ্গে চল শাইলি। তোর নিজের ঘরে। যেমন ঘর তেমনি আছে। আমি বারি করেছি, গাই পুষেছি, গোঠালা আছে। কোন কষ্ট হবে না তোর। কতদিন খবর নেই যশবীরের। একটু থামলো শুকুলাল। ঢোক গিলে বললো—মনে হয় আর তার কোন খবর হবেও না।

দুহাতে রণবীরকে বুকে চেপে ধরলো যন্তরে। জানতো সে

অনেকদিন আগে থেকেই মনে মনে। এই একটু আগে দরজার বাইরে শুনলো সে শুকুলালের মুখে, ও নিজে জলাপাহাড় থেকে খবর এনেছে। তাইতো ঢুকতে দিল শুকুলালকে। সে নিজেমুখে বোঝাতে পারতো না একথা শাইলিকে। এ ভালোই হল, শুকুলালই বলে দিল। আরো নুয়ে পড়েছে শাইলির মাথা।

—তোরা এত কষ্ট করে না খেয়ে মরবি কেন? বুড়ো বাজেই বা আর কত কষ্ট করবে। এবার বুজে আসে ওর গলা।

শান্তবীরের হাত থেমে গেছে অনেকক্ষণ। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে শুকুলালের মুখের দিকে। যেন এক আজব রূপকথা শুনছে সে।

—তোর কোন চিন্তা নেই। শান্তবীরও থাকবে। গাই দেখবে, ঘাস কাটবে। গোঠালা দুধ বেচবে ঘুরে ঘুরে। চল শাইলি, আজ রাত্রেই চল। এই বাড়ির বাকি কিরাই আমি মিটিয়ে দেব। তুই আমার বিয়ে-করা বৌ। আর তোর ছেলে আমারো ছেলে। আমাকে ফিরিয়ে দিস না শাইলি। এবার ওর একটা হাত নিজের মুঠিতে টেনে নেয়।

এতক্ষণে মাথা তুলে আয়ত ছলছল দুচোখ মেলে শুকুলালের মুখের দিকে তাকায় শাইলি। আশ্চর্য! এত পরিবর্তন? এমন মন বদল হওয়াও কি সম্ভব? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না এতক্ষণ। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না; অবিশ্বাস করতে পারলো না ওকে ওকে। এবার দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠলো শাইলি। মাথার ওপর আলতো ভাবে একটা হাত রাখলো শুকুলাল।

রণবীরকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যন্তরে। এবার ওর ফুলোফুলো দুগাল টিপে আদর করে। কোলের মধ্যে ওকে দোলাতে দোলাতে দুচোখ বুজিয়ে হাসে আপনমনে। অবোধ রণবীরও হাত পা ছোড়ে, অবাক চোখ মেলে তাকায় চারকুড়ি তিন বয়সের অবোধ শিশু যন্তরের হাসি হাসি মুখের দিকে।

সমাপ্ত